গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

# অধিকার

এপ্রিল-জুন, ২০২৫ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—


- প্রেস বিবৃতি / পৃ. ২
- সিন্ধু নদের চুক্তি / পৃ. ৩
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য ১০ম কিস্তি / পৃ. ৪
- গিগ ইকোনমি-গিগ ওয়ার্কার / পৃ. ৬
- সিডিআরও'র প্রেস বিবৃতি / পৃ. ১২
- নাগরিকপঞ্জির পথে ভোটার তালিকা / পৃ. ১৪
- প্রতিবেদন: আলিপুরদুয়ারে জমির পাট্টার জন্য কৃষকদের অন্দোলন / পৃ. ১৬
- প্রতিবেদন: তামান্না'রা বিচার চায় / পৃ. ১৭
- প্রতিবেদন: সুন্দরবনের জীবন / পৃ. ১৭
- এপিডিআর-এর জেল পরিদর্শন / পৃ. ১৮
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৯
- রিপোর্ট / পৃ. ২০-২৬
- মননে ছড়ানো যে বিষ / পৃ. ২৬
- টুকরো খবর: জিডিপি'র ধাঁধা / পৃ. ২৭
- শোকসংবাদ / পৃ. ২৮


সম্পাদনা: পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক: রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

**অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান**
**apdr.adhikar@gmail.com**

### সম্পাদকীয়

## কাগজ আমরা দেখাবো না

ফের এনআরসি'র শঙ্কা! নাগরিকত্ব হারানো অর্থাৎ সমস্ত অধিকার হারানোর শঙ্কা ফের চাপিয়ে দেওয়া হলো। বিহার দিয়ে শুরু। এবার আরও গুছিয়ে। আরও সুকৌশলে। রাজনৈতিক দলগুলিকে জড়িয়ে নিয়ে। সবার আশঙ্কা ছিল জনগণনার সঙ্গে এনপিআর-এর মাধ্যমে এনআরসি করার চেষ্টা করবে সরকার। প্রতিরোধের আশঙ্কায় সে পথেই গেল না এবার।

জনগণনা সরকারকে এবার শান্তিতে সেরে ফেলতেই হবে। কারণ, আগামীবারে সরকারে থাকতে হলে ডিলিমিটেশন করতেই হবে। তাই, এনপিআর করে এনআরসি'র পথে গেল না। কাজে লাগালো ইলেকশন কমিশনকে। ভোটার তালিকা আমূল সংশোধনের নামে পিছনের দরজা দিয়ে নাগরিকদের জন্ম তারিখ, জন্মস্থানের সার্টিফিকেট সহ যাবতীয় কাগজ-পত্র হস্তগত করে আসামের কায়দায় সন্দেহজনক ভোটার বা ডি-ভোটার ঘোষণা করা হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। তারপর তাদের তালিকা সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে; নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য।

কোনও রাখ-ঢাক নয়, সরকারের মুখপাত্ররা সংবাদমাধ্যমে পরিষ্কারভাবেই বলছেন, নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব প্রমাণ না-হলে প্রথমে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হবে। পরে সুবিধা মত সময়ে পুশব্যাক করা হবে। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য জন্ম তারিখ, জন্মস্থান সহ সমস্ত কাগজপত্র জোগাড় করা আপনার দায়িত্ব। রাষ্ট্রের কোনও দায় নেই। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড করা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বাধ্য করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরা বাড়ি বাড়ি এসে আপনার সব কাগজপত্র পরীক্ষা করবে। প্রত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। সমস্ত লোকের কাছে, আপনার সমস্ত কাগজপত্র পেশ করতে বাধ্য করা হবে। আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা পরিবারিবারিক গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না। ২০০২ বা ২০০৩ সালের পর যাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে তাঁদের সবাইকে ফের

নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। অথচ এদের ভোটেই গত প্রায় আড়াই দশক ধরে সরকার তৈরী হয়েছে। আজ যারা এদের নাগরিকত্বের পরীক্ষা নেবেন তারাও এদেরই ভোটে নির্বাচিত। কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসী, নদী বা সমুদ্র পাড়ে বসবাসকারি বা পাহাড়বাসী বা জঙ্গলবাসীরা কোথায় পাবেন তাদের জন্ম সার্টিফিকেট, সরকারি পরিচয় পত্র বা জমির মালিকানার কাগজ। কাগজ না দেখাতে পারলে 'ডি' ভোটার। শুধু তাই নয় নামের সামান্য ভুলেও অতীতে আসামে দেখা গেছে গ্রহণ করা হয়নি সেসব কাগজ। সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির ভয়ঙ্কর দলাদলি, প্রতিহিংসা। বিরোধী দলের ভোটার হলে নাম কাটার চেষ্টা চলবে। নতুন ভোটার হতে বাধা দেবে।

আসামের মতো বিহারেও দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো সরকারি প্রকল্পে পুরোপুরি সহযোগিতা করছে। মুখে এনআরসি'র প্রথম ধাপ বললেও কাজে কোনও বাধা দিচ্ছে না। আসামের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ভরসা করে মানুষ ডুবেছে। লক্ষ লক্ষ লোক নাগরিকত্বহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ভরসা করে আসামের জনগণ লড়াই করেনি। কাগজ জোগাড়ের হিড়িকে মেতে ছিল। বিহারেও দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলগুলির তরফে মৌখিক বিরোধিতা করা হলেও কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সহযোগিতাই করা হচ্ছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সচেতন করতে চাই। আগেরবার সাধারণ নাগরিকরাই রুখে দিয়েছিল এনআরসি প্রচেষ্টা। এবারও সেই দায়িত্ব নাগরিকদেরই নিতে হবে। জোরের সঙ্গে আবারও বলতে হবে ''কাগজ আমরা দেখাবো না"। কোনও অবস্থাতেই কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে দেব না। যে যেখানে শ্রম করে, সম্পদ সৃষ্টি করে, তিনি চাইলে সেই দেশেরই নাগরিক। কেউই বেআইনি নয়। ইট গাথা হলেই ঘর / ভেঙে দিলেই পৃথিবী।

---

## ASSOCIATION FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS (APDR)

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
১৮ মদন বড়াল লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

### প্রেস বিবৃতি

এপিডিআর সহ সারাদেশের নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলি এবং নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গত কয়েকমাস ধরে সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন। ভারতীয় সংসদের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও তাঁরা দেখা করেছেন ও হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। সিপিআই (মাওবাদী) দলের তরফেও এক তরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে ভারত সরকার দেশজুড়ে, বিশেষত মধ্য ভারত জুড়ে এক ভয়ঙ্কর কম্যুনিষ্ট নিধন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমি দখল করে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুন ও উচ্ছেদ করা হচ্ছে অসংখ্য আদিবাসী জনজাতির মানুষকেও। সংবিধান আদালত, বিচারব্যবস্থা কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে সরাসরি বিচার বহির্ভূত খতম অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ভারত সরকার। গত মঙ্গলবার রাতেও তারা ২৭ জন মাওবাদীকে বিনাবিচারে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে আছেন সিপিআই (মাওবাদী) দলের সাধারণ সম্পাদক বাসবরাজও। এই হত্যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছেন তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেনে বুঝেই ভারতরাষ্ট্র লাগাতার অগ্রাহ্য করে চলেছে সুপ্রীমকোর্টের সেই অমোঘ পর্যবেক্ষণ, ''প্রজাতন্ত্র নিজের সন্তানকে হত্যা করতে পারে না।"

একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদককে এভাবে হত্যার যে প্রতিক্রিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে প্রত্যাশিত তার ছিটেফোঁটাও না দেখে আমরা খুব হতাশ। বড় জোর একটা বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছে তারা। ছত্তিশগড়ে লাগাতার আদিবাসী উচ্ছেদ, রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যার বিরুদ্ধেও তারা সেভাবে সোচ্চার হচ্ছেন না। সংসদীয় রাজনীতিতে জনস্বার্থ রক্ষায় বিরোধী দলগুলির সক্রিয় প্রতিবাদী ভূমিকা না থাকলে প্রতিবাদী মানুষ কোথায় ভরসা খুঁজবে?

এই অবস্থায় আমরা ফের ভারত সরকারের কাছে অবিলম্বে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে শান্তি আলোচনা শুরু করার দাবি জানাচ্ছি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও এই দাবিতে সোচ্চার হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। অপারেশন কাগার সহ সমস্ত সমস্ত ধরণের খতম অভিযান বন্ধ রেখে শান্তি আলোচনা শুরুর করার জন্য সকলে মিলে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হোক। একইসঙ্গে আমরা দাবি জানাচ্ছি, বাসবরাজ ও অন্যান্যদের বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনায় অবিলম্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

এপিডিআর — কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে,
২২/০৫/২৫ — রঞ্জিত শূর, সাধারণ সম্পাদক

# সিন্ধু নদ-এর চুক্তি
## জলের জন্য জীবন, জীবনের জন্য যুদ্ধ?

ডাঃ অরিজিৎ মজুমদার এবং শিবাজী দাস

নদী কেবল শুধু মাত্র জল প্রবাহ নয়, প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে নদীকে তুলনা করা হয়েছে মাতৃসম। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে নদী তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। এই অভিপ্রায়ে যে, মনুষ্য জীবন প্রবাহ বয়ে চলবে নদীর প্রবাহমানতার সঙ্গে একই সমান্তরালে। একটি নদী, যার জল কেবল ফসল ফলায় না, বাঁচিয়ে রাখে দুই দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন। কিন্তু যদি সেই জল হয়ে ওঠে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যুদ্ধের কারণ? হিমালয়ের তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে কৈলাস পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ হয়ে পাকিস্তানে প্রবাহিত, সিন্ধু নদ এমনই এক জীবনরেখা।

সিন্ধু নদের জল ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি (Indus Waters Treaty) আজ এমনই এক বিপজ্জনক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এই চুক্তি শুধু জলের ভাগাভাগির গল্প নয়, এটি দুই শত্রু দেশের মধ্যে শান্তির এক অলৌকিক সেতু। কিন্তু ২০২৫ সালে ভারতের চুক্তি স্থগিতের ঘোষণায় সেই সেতু কি ভেঙে পড়তে চলেছে?

সিন্ধু জল চুক্তি একটি শান্তির স্বপ্ন, ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাজনের পর সিন্ধু নদ আর তার পাঁচটি উপনদী ঝিলাম (বিতস্তা), চেনাব (চন্দ্রভাগা), রাভি (ইরাবতী), বিপাশা ও শতদ্রু দুই দেশের মধ্যে বিবাদের বীজ বুনে দেয়। সিন্ধু নদী ব্যবস্থার জল পাকিস্তানের কৃষির প্রাণ, যা' দেশটির ৮০ শতাংশ সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ২৪ কোটি মানুষের জীবন ধরে রাখে। অন্যদিকে, ভারতের উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা এই নদীগুলির উপর নির্ভরশীল। এই জটিল সমস্যার সমাধান হিসেবে ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয় সিন্ধু জল চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী, পশ্চিমের তিন নদী, সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব পাকিস্তানের জন্য এবং পূর্বের তিন নদী রাভি, বিপাশা, শতদ্রু ভারতের জন্য বরাদ্দ হয়। ভারত পশ্চিমের নদীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করতে পারে, তবে পাকিস্তানের জল প্রবাহে বাধা দেওয়া যাবে না। এই চুক্তি তিনটি যুদ্ধ (১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯) এবং অসংখ্য সংঘাতের মধ্যেও টিকে থেকেছে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আইজেন -হাওয়ার এটিকে বলেছিলেন, "বিশ্বের অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল আলো"। এই বিরোধগুলি সিন্ধু নদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বের অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত নদীগুলিও একই ধরণের চ্যালেঞ্জ ও সহযোগিতার উদাহরণ প্রদান করে, যা' সিন্ধু জল চুক্তির প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয়।

সিন্ধু জল চুক্তির মত বিশ্বের অনেক নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা' সহযোগিতা ও বিরোধ উভয়ই সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ, নীল নদ মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, উগান্ডা সহ ১১টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ইথিওপিয়ার গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ নির্ম্মাণ মিশরের জন্য জল প্রবাহ হ্রাসের আশঙ্কা তৈরী করেছে, যা' সিন্ধুতে ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে পাকিস্তানের উদ্বেগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ২০২১ সালে মিশর এটিকে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি বলে সামরিক হস্তক্ষেপের হুঙ্কার দেয়। তবে, নীল বেসিন ইনিশিয়েটিভ জলের টেকস ব্যবহারে সহযোগিতার চেষ্টা করে। মেকং নদী, চীন, লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, এবং ভিয়েতনামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, একইভাবে চীনের উজানে বাঁধ নির্ম্মাণের কারণে বিরোধের সম্মুখীন। এই বাঁধগুলি নিম্নাঞ্চলের কৃষি ও মৎস্যসম্পদের ক্ষতি করছে, যেমন ২০২০ সালে ভিয়েতনামের মেকং ডেল্টায় মৎস্য উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে যায়। মেকং রিভার কমিশন তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এই বিরোধ কমানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিপরীতে, ড্যানিউব নদী, যেটি জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া সহ ১০টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, এবং সফল সহযোগিতার উদাহরণ। ১৯৯০-এর দশকে হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে বাঁধ নিয়ে বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতে গেলেও, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্যড্যানিউব রিভার (ICPDR) দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জল ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি এনেছে।

আজ সেই আলো কি নিভে যাচ্ছে? কেন জল হয়ে উঠছে যুদ্ধের অস্ত্র? ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল, জম্মু কাশ্মীরের পাহালগামে এক সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে এবং পরের দিনই সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। পাকিস্তান এটিকে 'যুদ্ধের ঘোষণা' বলে আখ্যা দিয়ে সিমলাচুক্তি স্থগিত ও ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধের হুমকি দেয়। কিন্তু কেন এত উত্তেজনা? কিশনগঙ্গা ও রাটল বিতর্কঃ ভারতের জম্মু কাশ্মীরে কিশনগঙ্গা (৩৩০ মেগাওয়াট) এবং রাটল (৮৫০ মেগাওয়াট) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে পাকিস্তান বার-বার আপত্তি তুলেছে। তারা বলছে, এই প্রকল্পগুলি চুক্তি লঙ্ঘন করে তাদের জল প্রবাহ কমিয়ে দেবে। ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক আদালত ভারতের পক্ষে রায় দেয়; তবে শর্ত দেয় যে, পাকিস্তানের জল কমানো যাবে না। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। ২০২৩ সালে ভারত

চুক্তি সংশোধনের দাবি জানায়, আর পাকিস্তান তা' প্রত্যাখ্যান করে।

কাশ্মীরের ছায়া সিন্ধু নদীর উৎস কাশ্মীরে। পাকিস্তান ভয় পায়, ভারত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে তাদের জল বন্ধ করতে পারে। ২০১৬ সালে উরি হামলার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ''রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না।'' এই বক্তব্য আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, বন্যা ও খরার ঝুঁকি বাড়ছে। পাকিস্তানে ইতিমধ্যে জলের ঘাটতি ২০-২৫ শতাংশ। এই সঙ্কটে চুক্তি ভাঙলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। জল মানে জীবন, মানবিক দিক দিয়ে এই চুক্তি শুধু কাগজের নথি নয়, এটি কোটি-কোটি মানুষের জীবনের ভিত্তি। পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষি সিন্ধু নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। এই জল ফসল ফলায়, পরিবার পোষে, দেশ বাঁচায়। ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়াণা ও রাজস্থানের কৃষকরাও পূর্বের নদীগুলির উপর নির্ভরশীল। চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশই বন্যা ও খরার পূর্বাভাস পায়, যা' লক্ষ-লক্ষ জীবন বাঁচায়। কিন্তু ভারতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত: জলপ্রবাহের তথ্য বন্ধ করা। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করছে। পাকিস্তানের কৃষক নেতা খালিদ হুসেন বাথ বলেছেন, ''জল বন্ধ হলে আমাদের ফসল শুকিয়ে যাবে, আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।'' ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে, তারা বলছে, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের সমর্থনের কারণে এই পদক্ষেপ জরুরী। কিন্তু এই তর্ক-বিতর্কের মাঝে সাধারণ মানুষই পিষে যাচ্ছে।

চুক্তি ভাঙলে কী হবে? ভারত যদি চুক্তি পুরোপুরি ভাঙে, তবে ফলাফল ভয়াবহ হবে, পাকিস্তানের জন্য। কৃষিধ্বংস। জল বন্ধ হলে পাকিস্তানের ৪৭ মিলিয়ন একর কৃষিজমি শুকিয়ে যেতে পারে, খাদ্য সংকট দেখা দেবে। জলের অভাব ২০৫০ সালের মধ্যে পাকিস্তানের মাথা পিছু জলের পরিমাণ ৪০ শতাংশ কমে যাবে। এই সঙ্কট আরও গভীর হবে। বন্যার ঝুঁকি, জলাধার থেকে হঠাৎ জল ছাড়লে পাকিস্তানে বিধ্বংসী বন্যা হতে পারে। ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ, চুক্তি ভাঙলে ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে। বাংলাদেশ ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে। চীনের হস্তক্ষেপ সিন্ধুর উৎস তিব্বতে নিয়ন্ত্রণ করে চীন। তারা ব্রহ্মপুত্রের জল নিয়ে তোলপার করতে পারে, যা' ভারতের জন্য নতুন সঙ্কট তৈরী করবে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সঙ্ঘাতের ঝুঁকি বাড়বে, যা' দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করবে। আইনি ও আন্তর্জাতিক পরিণতি চুক্তির একতরফা লঙ্ঘন ভিয়েনা কনভেনশন (VCLT)-এর ৬০ ও ৬২ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করবে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ) বা অন্য ফোরামে মামলা করতে পারে। যদিও প্রয়োগ কঠিন। ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে, বিশেষ করে জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসনের জন্য তার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। তবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের কাছে এখনই জল বন্ধ করার মতো অবকাঠামো নেই। তাই স্বল্পমেয়াদে প্রভাব সীমিত হলেও, দীর্ঘমেয়াদে বাঁধ নির্ম্মাণ হলে পাকিস্তানের জন্য বিপদ বাড়বে।

একটি আশার আলো? এই সংকটের মধ্যেও সমাধানের পথ আছে। বিশ্বব্যাঙ্ক আবারও মধ্যস্থতা করতে পারে। দুই দেশ মিলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে পারে। জলের এই গল্প শান্তির গল্প হতে পারে, যদি দুই পক্ষই সহযোগিতার হাত বাড়ায়। সিন্ধু নদী শুধু জলের ধারা নয়, এটি জীবন, আশা আর স্বপ্নের প্রতীক। এই চুক্তি ভাঙলে শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলের জন্য যুদ্ধ নয়, শান্তির জন্য হাত মেলানোই এখন প্রয়োজন। সিন্ধু তার প্রবাহে সবাইকে এক করুক, এই প্রত্যাশা।

## আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

''যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরম পন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ মন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সাকলে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে, যদিও এই রিপোর্ট জনসমক্ষে আসেনি।''

*(দশম কিস্তি)*

Extending Panchayati Raj to the Scheduled Areas (PESA)

*Our system is built on distrust in people. Trust in people must be submitted for trust in Beaurocracy. Public servants must be servants of the people ,not it's masters.*

*– Mr. Allen 0ctavian Hume , I. C. S.*

''স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ও দূরীভূত হওয়া সম্ভব যদি একবার স্বীকার করে নেওয়া হয় যে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির পরম্পরাগত সামাজিক ব্যবস্থাই হল আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে শাসন প্রণালীর (governance) মূল ভিত্তি।

তাহলেই আপাতভাবে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই প্রশাসনিক উপরি কাঠামোটিকে তারা তাদেরই সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখবে, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিন্দুমাত্র বৈরিতাসম্পর্ক মূলক ব্যবস্থা হিসেবে নয় ।"

এই বিবৃতিটি ভুরিয়া কমিটির মহতী আকাঙ্ক্ষার সারনির্যাস; যে কমিটি গঠিত হয়েছিলই কিছু 'ব্যতিক্রমী ও পরিবর্তনকামী' প্রস্তাব দেওয়ার জন্য– সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদ [Part 9 of the Constitution concerning Panchayats to the scheduled areas (5A)]-কে সম্প্রসারিত করার জন্য যা ছিল অত্যাবশ্যক।

১৯৯৩ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে নবম অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েত সম্পর্কিত ধারা যুক্ত করা হয়। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনটি স্বাধীনতার পর সংবিধানের পঞ্চম তফসিল (5th schedule of the Constitution) ভারতের সেই আটটি রাজ্য সম্পর্কিত যেখানে ব্যাপক সংখ্যায় আদিবাসীদের বসবাস– অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান ।

ষষ্ঠ তফসিল চিহ্নিত করে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে যে রাজ্যগুলিতেও ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসীরা বিদ্যমান। পাস হওয়া প্রথমতম আইন যা এই প্রথম তফসিলভুক্ত অঞ্চল গুলিকে এতদিনকার রুটিন দৃষ্টিতে দেখেনি।

এবং তদনুযায়ী সংসদের কিছু সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্বাচিত সদস্য ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ১৯৯৪ সালে গঠন করা হল যাতে তারা সিডিউলড্ অঞ্চল গুলিতে পঞ্চায়েত আইন বিস্তৃত করার জন্য নবম অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় Exception ও Modification এর প্রস্তাব দিতে পারেন। এই কমিটি ১৯৯৫ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করলেন। ভারত সরকার সাধারণভাবে রিপোর্টটি গ্রহণও করলেন।

The Provitions of Panchayats (Extention to the Sceduled Areas) Act (PESA) আইন হল ১৯৯৬ থেকে।

The Provisions of Part 9 of the Constitution were extended to SA subject to the special features mentioned in section 4.

১৯৯৬-এর ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে PESA কার্যকরী হলো।

The Broad Scheme of PESA

(PESA–বিস্তৃত প্রকল্প)

সংবিধানের পঞ্চম তফশীল (FS), অধ্যুষিত (scheduled) অঞ্চলে প্রশাসনিক মূল কাঠামো সম্পর্কে নির্দেশ করে। প্রশাসনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি অবশ্যই সর্বাঙ্গীন ও সর্ব্বব্যাপী (Inclusive)। অধ্যুষিত অঞ্চলে (সিডিউলড এরিয়ায়) রাজ্যপালই মূল আইন প্রণয়নকারী হবেন। পঞ্চম তফশীলের অনুমোদনক্রমে– ১) রাজ্যপাল রাজ্যের সর্ব্বত্র বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে রাজ্য অথবা কেন্দ্রের যে-কোনও আইন অধ্যুষিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োগ করতে পারার ক্ষেত্রে এবং ২) "....for the peace and the good Government of– a Scheduled Area"— সপ্তম তফশীলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সীমানা পেরিয়েও যে-কোনও বিধি নিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী।

(The seventh Schedule of the Constitution distribute legislative powers between Parliament and State legislatives as per the lists Union list, State list and Concurrent list of subjects)

এই ধারা অনুযায়ী আদিবাসী মানুষদের সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করতে চাইলে তার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছে, যাতে করে সদিচ্ছা থাকলে যতটা সম্ভব নমনীয় ও সর্বাঙ্গীণ একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, এই সম্ভাবনা বলতে গেলে আজ পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেছে। কোনও-কোনও রাজ্যপাল কখনও তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার ও বিদ্যমান বাস্তবতা (Ground Reality)-র মধ্যে যে সামঞ্জস্যহীন বিশাল ব্যবধান তাকে অস্বীকার করেও যে পঞ্চম তফশীলের (FS) ৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ অবশ্যই করেছেন কিন্তু তা' ঘটেছে কদাচিৎ, মাত্র বহু-বহু কালের ব্যবধানে।

বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে স্মরণে রাখা দরকার যে সপ্তম তফশীলের তিনটি তালিকার কোনটিতেই আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। ফলতঃ এই সম্পর্কিত কোনও আইন কার্যকরী হতে পারে— ".... either in term of specific provision in the Constitution including' "regulations" under the Fifth schhedule, or under item 97, "any other matter... " Of the Union list. রাজ্য সরকার প্রণীত বহু আইন স্বতঃস্ফূর্ত -ভাবেই অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়। এমন-কী সেই সমস্ত আইন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এই সমস্ত আইনি ঘেরাটোপ আদিবাসীদের সমাজ সম্বন্ধে এক ব্যাপক দ্বৈধতা বা সংশয় নির্ম্মাণ করে। আর তার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়েই চলে প্রশাসনের দিক থেকে সিদ্ধান্তহীনতা ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উন্নাসিকতা–দুই-ই।

ঐতিহ্যগত ও আজকের প্রথাগত পদ্ধতি(The Traditional and Formal System)

আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে প্রথম যখন পরম্পরাগত ও প্রথাগত ব্যবস্থা দু'টি মুখোমুখি হয় তখন অতি অবশ্যই তা'

বিরোধ, সংক্ষুব্ধ হয়। ব্রিটিশ অনুষ্ঠিত ‘‘বাইরে সরিয়ে শাখা রাখার কার্য্যনীতি’’ (The Policy of ‘exclusion’ follwed by the British) এই সংঘাতকে পরিপুষ্ট করেছে। ঐতিহ্যগত ও আজকের প্রথাগত (formal) ব্যবস্থার মধ্যে এই অমসৃণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন ভূমিকা নিচ্ছে রাজ্যগুলি– যখন তারা সরাসরি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিষেবা মূলক কাজগুলি রূপায়িত করার সময় সরাসরি কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই ধরণের রাজ্য সরকার সেবিত কর্ম্মসূচীগুলি কোনও ব্যত্যয় ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিজস্ব পরিকাঠামোর খাঁচার মধ্যে দিয়েই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়েই রূপায়িত হয় যে, প্রতিষ্ঠানগুলি একমাত্র রাজ্য সরকারের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবে। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রথা মাফিক (Formal) কাঠামো (structure) বানানো হয়েছিল সেগুলি সাধারণভাবে পরম্পরাগত ব্যবস্থাগুলিকে উপেক্ষাই করেছিল। একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামকে একত্র করে গ্রাম সমষ্টির ক্ষেত্রে গ্রামের উন্নতির জন্য এইভাবে গড়ে তোলা প্রশাসনিক কাঠামোগুলো সরকারি ব্যবস্থার অঙ্গ হওয়ার বলে অবশ্যই গ্রামীণ চিরায়ত ব্যবস্থাগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ্য ভূমিকা দখল করতে লাগল। সবমিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কার্য্যাবলী সরকারের হাতে থাকায় তা' অসংখ্য বাধা, প্রতিবাদকে নস্যাৎ করে ট্রাডিশনাল ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বসিয়ে দিল। আজকে আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে যেটুকু পরম্পরাগত ব্যবস্থা টিকে আছে তার মাত্রাতেও ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঝাড়খন্ড রাজ্যের ক্ষেত্রে ট্রাডিশনাল ব্যবস্থা এখনো সবচেয়ে শক্তিশালী ‘হো’ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সাঁওতাল ও মুন্ডাদের মধ্যে অনেক দুর্বল এবং খুব বেশি দুর্বল হয়েছে ওঁরাও-দের ক্ষেত্রে। ওঁরাও-দের ক্ষেত্রে ট্রাডিশনাল জনগোষ্ঠীটি এখন নামেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে মাত্র। তাদের অস্তিত্ব যেন শুধুমাত্র ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই টিকে আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখা এবং কিছুটা পরিমাণে আধা-সামাজিক বিষয়গুলিতেও, যেমন নেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে সামাল দেওয়া– এইসব সরকারি কাজগুলো পুরোপুরি করা হয় ফরমাল প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে দিয়েই। এইরকম দিশেহারা এক স্থান-কালে PESA সারাদেশ জুড়েই বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে এক ব্যাপক প্রত্যাশার চাহিদার জন্ম দিল।

**এপিডিআর-এর মুখপত্র**
**‘অধিকার’ পড়ুন ও পড়ান**

# গিগ ইকোনমি-গিগ ওয়ার্কার: পুঁজির শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর

সন্তোষ সেন

গিগ ইকোনমি হল ইন্টারনেট এবং অ্যাপের উপর নির্ভরশীল একটা মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী বাজার ব্যবস্থা। এই বাজারে কর্ম্মসংস্থান সাময়িক এবং মজুরী নামমাত্র। প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্পমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে তাদের ইচ্ছামতো কর্ম্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী একটা ভদ্রস্থ মাইনের পরিবর্তে অনেক অল্প বেতনে নিয়োগ করে এবং কর্ম্মীদের কাজের পরিমাণ এবং উপভোক্তার দেওয়া মূল্যমানের (রেটিংস) ওপর পারিশ্রমিক প্রদান করে। বলাই বাহুল্য যে, চাকরি শেষে কোম্পানির আর কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা দৌড়ে আজকের ‘রাণা’ররা পিঠে ব্যাগ বা দু'চাকার গাড়িতে আরোহী নিয়ে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয় জীবনের এক অমূল্য সময়। এইভাবেই গিগ প্ল্যাটফর্ম বদলে দিচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি এবং চাকরি বা ব্যবসার পরিবেশ। এই ক্ষেত্রে কাজ পুরোটাই চুক্তিভিত্তিক এবং অবশ্যই স্বল্প সময়ের জন্য, তাই একে ‘গিগ’ বলা হয়।

### গিগ ও প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির জমি তৈরী হল যে পথ ধরে

প্রথমেই দেখা যাক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হল কীভাবে। পুঁজিবাদী যুগের শুরুতে ছোট-মাঝারি কারখানায় একই ক্যাটাগরির কাজে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন ছিল প্রকটভাবেই। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে একই কাজে সম-মাইনে এবং সমতার দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন, অবরোধ, ধর্মঘট করতে শুরু করলেন। এবং এই লড়াই কারখানায় চত্বর থেকে বেরিয়ে সমাজ কাঠামোয় ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সহযোগিতা-সহমর্ম্মিতা ও যুথবদ্ধতাকে ভাঙার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করার লড়াই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শ্রমিকরা এই সময়ই ‘শ্রেণী’ হিসেবে সংগঠিত হল। শ্রমিকদের সমতার দাবির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা নিয়ে এল ‘সাপ্লাই-ডিমান্ড’ এর তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল নির্য্যাস- শ্রমিকদের সরবরাহ বেশী থাকলে স্বভাবতই চাহিদা কমবে এবং তাঁরা মজুরী কম পাবেন।

পুঁজিবাদের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কার্ল মার্কস কলম ধরলেন। ক্যাপিটালের প্রথম খন্ডে তিনি স্পষ্ট করে বললেন, ‘‘পুঁজি দুইদিকে একযোগে কাজ করছে। তার সঞ্চয়ন যদি একদিকে শ্রমের চাহিদা বাড়ায়, অপরদিকে সে শ্রমিকদের ‘মুক্ত করে

দিয়ে' শ্রমের সরবরাহ বাড়ায়; সঙ্গে সঙ্গে আবার বেকারদের চাপ নিযুক্তদের বাধ্য করে আরও শ্রম যোগাতে; অতএব শ্রমের সরবরাহকে কিছু পরিমাণে শ্রমিকদের সরবরাহ থেকে স্বাধীন করে তোলে। এই ভিত্তিতে শ্রমের সরবরাহ ও চাহিদার নিয়মের ক্রিয়া, পুঁজির স্বেচ্ছাচারিতাকে সম্পূর্ণ করে তোলে। কিন্তু যেই শ্রমিকরা গোপন রহস্যটা জেনে ফেলে, যে পরিমাণে তারা কাজ বেশী করে, যে পরিমাণে অন্যদের জন্য বেশী ধন উৎপাদন করে এবং যত তাদের শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়ে, ঠিক সেই পরিমাণে কীভাবে পুঁজির আত্মপ্রসাদের উপকরণ হিসেবে তাদের ভূমিকা পর্যন্ত তাদের নিজেদের পক্ষে ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়; যে-ই শ্রমিকরা আবিষ্কার করে যে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার মাত্রা সম্পূর্ণতই নির্ভর করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার চাপের উপর (অর্থাৎ কারখানার বাইরে প্রচুর শ্রমিক কাজ পাওয়ার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে); যে-ই ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির সাহায্যে তারা কর্ম্মরত ও বেকারদের সঙ্গে একটা নিয়মিত সহযোগ সংগঠিত করে তোলার চেষ্টা করে যাতে করে তাদের শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী কায়দার উৎপাদনের এই স্বাভাবিক নিয়মটির মারাত্মক ফলাফলকে দুর্বল বা নষ্ট করতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির স্তাবক, অর্থশাস্ত্রবিদরা চিৎকার করে ওঠে সরবরাহ ও চাহিদার 'শাশ্বত' ও 'পবিত্র' নিয়মকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে। কর্ম্মরত ও বেকারদের যে-কোনও সংযোগ এই নিয়মের 'সুসমঞ্জস' ক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপরদিকে পুঁজি এই অসুবিধাজনক ক্রিয়াকে পীড়নমূলক উপায়ে ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।" *[কার্ল মার্কস পুঁজি, প্রথম খন্ড (দ্বিতীয় অংশ), প্রগতি প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১]।*

মার্কসের এই সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বে। শ্রমিকদের সমমজুরি এবং সমতার দাবির সাথে যুক্ত হল বুর্জোয়াদের 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার' স্লোগান। শ্রমিকশ্রেণী এই দাবিকে সামনে রেখে বুর্জোয়াদের সাথে একযোগে ফ্রান্সের সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সম্রাট পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হল মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে। এর পরপরই শ্রমিকদের সব দাবি-দাওয়া নস্যাৎ করে তাঁদের সংগঠিত শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করতে ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে শ্রমিকদের আন্দোলনের ওপর গুলি চলে। শ্রমিকরা জীবন দিয়ে বুঝলেন, পুঁজির এই শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকদেরও পাকাপোক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা বুর্জোয়াদের সঙ্গ ত্যাগ করে প্রকৃত অর্থে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হলেন এবং এই অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় ১৮৭১ সালে গড়ে উঠল 'প্যারি কমিউন'। পৃথিবীর মানুষ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি উন্নত সমাজের রূপরেখা কেমন হতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি প্রমাদ গুণলো। ফ্রান্স সহ ইউরোপের বুর্জোয়ারা তাদের সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে প্যারিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে একটি উন্নত নতুন সমাজের অঙ্কুর ৭১ দিনের শিশু 'প্যারি কমিউন'কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

প্যারি শহরের শ্রমিকরা এই অসম লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, এখন আর এভাবে এগোনো যাবে না। তাই বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেই আট ঘন্টার কাজের দাবির এবং সম-মজুরী ও সমতার লড়াইকে তাঁরা তীব্র করলেন। ১৮৮৬ সালে এসে শ্রমিকদের এই লড়াই বিশ্বজনীন চেহারা নিল, শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক পরিচয় পেল। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ আটঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল। এরপর ১৯১৭ তে রাশিয়ার সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর মাথা আবারও ঘুরে গেল। শ্রমিকশ্রেণীর এই আগুয়ান ও সংগঠিত শক্তিকে সামলাতে ১৯২০ সালে মালিকপক্ষ সামনে আনল 'নিউ লিবারেল অর্থনীতির' তত্ত্ব। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর যূথবদ্ধতাকে ভাঙতে এই তত্ত্ব নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী দাপিয়ে ব্যাট করে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব পুঁজিবাদ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে একদিকে 'Sanction economy' এবং অত্যন্ত সুচতুরভাবে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'র বিরুদ্ধে ব্যক্তির তথাকথিত স্বাধীনতা ও ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেল।

**পুঁজি চরিত্রগতভাবেই আন্তর্জাতিক**

কেইন্স-এর তত্ত্বকে সামনে রেখে ১৯৪৪ সালে 'ব্রেটন উডস' সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুঁজির আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি গঠন করা হল। কিন্তু ইতিহাসের কী নির্ম্মম পরিহাস! ১৯৪৩ সালেই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' ভেঙে দিয়ে কমিউনিষ্টরা জাতীয় স্তরে, এমন-কী একটি কারখানার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় পুঁজির আন্তর্জাতিক শক্তিকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলেন। অন্যদিকে, ১৯৭৩ সালে ডলারকে তেল-অর্থনীতির সাথে যুক্ত করা হল। ক্রুড পেট্রোলিয়াম কেনাবেচা শুধুমাত্র ডলারের মধ্য দিয়েই করতে হবে, এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ডলার সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার লাভ করল। নব্বইয়ের দশকে এসে নয়া উদার অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে বড়-বড় কারখানা ও সংস্থাগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো করা হল। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উপকরণকে তৃতীয় বিশ্বের কোণে-কোণে ছড়িয়ে

দেওয়া হল। সস্তা শ্রম ও অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে পুঁজির 'ভেলোসিটি অফ টার্নওভার' অনেক বেড়ে গেল ঠিকই। সাথে-সাথে বিশ্বজুড়ে দু'টি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে গেল—

এক) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত শক্তি ও যূথবদ্ধতাকে ভেঙে তাঁদের একক ব্যক্তিমানুষে পরিণত করা হল, ফলে মালিকশ্রেণীর নয়া-নয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগঠিতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে সেভাবে রুখে দাঁড়াতে পারলো না।

দুই) সারা বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ বেড়ে গেল প্রচুর পরিমাণে (বর্তমানে ৫০ বিলিয়ন মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে), পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে ঊর্দ্ধগতিতে। সমুদ্র জলের তাপমাত্রা ও জলস্তর বেড়ে গেছে বহুল পরিমাণে। হিমালয় ও মেরু প্রদেশের বরফের চাদর গলছে অতি দ্রুত হারে। কর্পোরেটের স্বার্থে কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগের ফলে জলের দূষণ ও সংকট বেড়েছে বহুগুণ। জল ও খাদ্য শৃঙ্খলে বিষ ঢুকে পড়ায় মানুষের রোগ অসুখ দিন-দিন বাড়ছে। বায়ুদূষণের কবলে শ্বাসকষ্ট সহ ফুসফুসের নানান রোগ এমনকী কালান্তক ক্যান্সারও আজ ঘরে-ঘরে। কৃষিবাস্তুতন্ত্র এক সামগ্রিক সঙ্কটে, কৃষকরা বারবার করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজির অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপর্যস্ত হচ্ছে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষ সহ তামাম প্রাণী জগৎ।

### পুঁজির সারপ্লাস ভ্যালু শ্রমিকদের কোথায় ঠেলে দিল

পুঁজির সঞ্চয়ন ও মুনাফা বৃদ্ধির হারকে বজায় রাখতে সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত মূল্যকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলতে হয়। কোনও কারখানা স্থাপন বা সেই অর্থে মানুষের ব্যবহারযোগ্য কোনও পণ্য উৎপাদন না-করে এবং বিরাট অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ না-করেও প্রযুক্তির সাহায্যে মূলত অ্যাপনির্ভর মার্কেটিং ও সার্ভিস সেক্টরে বিপুল বেকার বাহিনীকে কাজে লাগানো হল অত্যন্ত কম মজুরিতে চুক্তিভিত্তিক কর্ম্মী হিসেবে। যার হাত ধরে কর্ম্মীদের জীবন যন্ত্রণা বেড়ে গেল বহুগুণে। পুঁজির বিকাশের যুগে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিভাজন-তো ছিলই। উদার অর্থনীতির যুগে কল-কারখানা, শিল্পসংস্থা নানান জায়গায় ছোট ছোট আকারে ছড়িয়ে পড়ায় উদ্ভব হল পরিযায়ী শ্রমিকদের। তবুও এই অংশের একটা 'শ্রমিক পরিচয়' ছিল কোন-না-কোন উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে। কিন্তু গিগ ওয়ার্কাররা উৎপাদনের জগতে সরাসরি যুক্ত না-থাকায় শ্রমিক পরিচয় ঘুচিয়ে কেবলমাত্র কর্ম্মীবাহিনী হিসেবে চিহ্নিত হল। শ্রমিক নয় বলেই তাদের জন্য শ্রমকোডের কোনও বালাই নেই; নেই সংগঠন করার অধিকার। প্রযুক্তির সাহায্যে সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে এইসব কর্ম্মীদের কাজের ওপর নজরদারি বাড়ানো হল। ঠিক সময়ে গরমা-গরম খাবার খদ্দেরদের কাছে পৌঁছেছে কী-না, সঠিক সময়ে যাত্রীকে গাড়িতে তোলা-নামানো হচ্ছে কী-না, এমন সব কিছু, অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল বা কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।

### তথ্য ও পরিসংখ্যান কী বলছে

সংসদের বাদল অধিবেশনে (২০২২ সালে) এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পেশ করা সরকারি তথ্য বলছে, বিগত আট বছরে মোদী জামানায় মাত্র ৭,২২০০০ মানুষ স্থায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছেন, যদিও এই সময়ে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২২ কোটি ৫ লক্ষ। অর্থাৎ এই বিপুল বেকার বাহিনীর মধ্যে বছরে আট লক্ষ মানুষেরও চাকরি হয়নি। চাকরি হবে কোথা থেকে? সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ সব সংস্থাগুলোকে-তো শুকিয়ে মারা হয়েছে বা সস্তায় কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঠিকা, পরিযায়ী শ্রমিক ও গিগ-কর্ম্মীর সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। অন্য একটি তথ্যানুসারে, ২০১৭ সালে গিগ অর্থনীতিতে আমেরিকার সাড়ে পাঁচ কোটি কর্ম্মী যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আমেরিকার মোট শ্রমিক কর্ম্মচারীর ৩৬ শতাংশই যুক্ত গিগ প্লাটফর্মে। ৩৩ শতাংশ কোম্পানির বেশিরভাগ কর্ম্মীই হলেন গিগার। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আমেরিকার মোট গিগারদের ৪৪ শতাংশেরই প্রধান আয়ের উৎস হল গিগ ইকোনমির জগতে। ১৮-৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫৩ শতাংশই যুক্ত চুক্তিভিত্তিক সার্ভিস ও মার্কেটিং সেক্টরের পরিসরে। আমেরিকার মত দেশেও বেকারত্বের হার ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় নতুন করে আরও প্রচুর মানুষ গিগ প্লাটফর্মে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য হবেন।

ভারতবর্ষেও গিগ শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে হু-হু করে। 'বোষ্টন কনসাল্টিং গ্রুপ' আর 'মাইকেল অ্যান্ড সুজান ডেল ফাউন্ডেশন' একটি গবেষণায় জানিয়েছে, আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ভারতের গিগ অর্থনীতি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে যেখানে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের কর্ম্মসংস্থান এই গিগ অর্থনীতিতে হচ্ছে তা' বেড়ে হবে ২.৪০ কোটি। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্টও এই বাস্তবতার মান্যতা দেয়। আগামী আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই প্রায় নয় কোটি মানুষ এই অর্থনীতির মধ্যেই কর্ম্মসংস্থান পাবেন। কারণ, মূলধারার অর্থনীতি আরও সঙ্কুচিত হবে ও সুরক্ষিত কর্ম্মসংস্থান অতীতের বস্তুতে পরিণত হবে। তথ্য বলছে, আমাদের দেশে সক্রিয় গিগ কর্ম্মীর সংখ্যা ২০২৩-এর প্রথম

পাঁচ মাসে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কিছু সংস্থায় গিগ কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ। এই সময় জুড়ে হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু আর চেন্নাই-এর মত শহরে গিগ কর্ম্মীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ৪৮ শতাংশ গিগ কর্ম্মীই হল ১৯-২৫ বছর বয়সী নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, যাদের কাছে স্থায়ী চাকরির সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। মহিলাদের সংখ্যা ২৮ শতাংশের আশেপাশে। তাঁরা চাইছেন পড়াশোনা বা সংসারের কাজ সামলে নিজেদের সুবিধামতো ফ্লেক্সিবেল কাজে যুক্ত হয়ে পড়াশুনার খরচ তুলতে বা এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসারের জন্য কিছুটা বাড়তি উপার্জন করতে।

একটা বিষয় দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, আগামী দিনে ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্থায়ী চাকরি, মাস গেলে মোটামুটি একটা ভদ্রস্থ মাইনে, ডি এ, অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি, পেনশন এইসব জাদুঘরে জায়গা নেবে। যে ভবিষ্যৎ পড়ে থাকবে তা' হল, দু'বেলা-দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে হলে ৩৬৫ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা দৌড়াতে হবে স্বল্পমেয়াদী চুক্তির অস্থায়ী চাকরির পিছু-পিছু। শরীর-স্বাস্থ্য ও খাওয়া-দাওয়ার তোয়াক্কা না-করে জীবন হাতে নিয়ে শুধু দৌড়, দৌড়, আর দৌড়! না-হলে জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে। মানবসম্পদের কী চূড়ান্ত অবমাননা করে চলেছে বর্তমান যুগের এই গিগ অর্থনীতি।

**গিগ ওয়ার্কারদের কাজের ক্ষেত্র এবং শর্ত**

গিগ অর্থনীতির জগতে মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর সার্ভিস সেক্টরে ও মার্কেটিংয়ে মানুষ কাজ পান মাসিক ১২-১৫ হাজার টাকার মজুরীতে। কোনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি নেই! চাকরি শেষে মালিককে কোনও দায়-দায়িত্ব নিতে হবে না। কোনও সাপ্তাহিক ছুটির বালাই নেই। কাজে না-এলে মাইনেও নেই। অর্থাৎ, সঙ্কুচিত কর্মসংস্থানের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খুদ-কুঁড়ো ছিটিয়ে সস্তার শ্রমিক বাহিনী তৈরীর এক বৃহৎ পরিসর এই গিগ প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন কারখানাতেও এই প্রথায় নিয়োগ শুরু হয়েছে। আর সরকারি ক্ষেত্রে নতুন করে চুক্তিতে ঠিকা কর্ম্মী নিয়োগের নমুনা-তো আমরা লক্ষ্য করলাম 'অগ্নিপথ' প্রকল্পে। সরকারি সব দায় ঝেড়ে ফেলে অগুণিত বেকার বাহিনীর অমূল্য মানবসম্পদকে জলের দরে কিনে নিয়ে 'দেশপ্রেমিক' তৈরীর সুকৌশলী প্রচেষ্টা। এই পথ ধরে ব্যাঙ্কেও শুরু হতে চলেছে গিগ চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ী কর্ম্মী নিয়োগ। ইউনিয়নগুলি খুব সঙ্গত ভাবেই অভিযোগ করেছে যে, ব্যাঙ্কশিল্পে কর্ম্মী ও আধিকারিকদের সংগঠনকে দুর্বল করে দেবার উদ্দ্যেশে এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের উদ্যোগ। সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''ব্যাংক শিল্পে কর্ম্মী ও অফিসার মিলে ৪১ হাজার পদ খালি আছে, এছাড়া নিয়মিত ভাবে অবসর নিচ্ছেন বহু কর্ম্মী।''

গিগ ওয়ার্কারদের কাজের জায়গাগুলি হল, ওলা-উবের-এর মতো ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং সুইগি জোম্যাটো-এর মত নানান দোকান থেকে নানান কিসিমের খাবার সংগ্রহ করে ডেলিভারি বয় বা গার্ল'রা উপভোক্তার বাড়িতে সরবরাহ করা। আর আছে, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, জিও-মার্ট-এর মত অনলাইন শপিংয়ের দুনিয়ায় বাইকে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্ডার করা মাল সরবরাহ করা।

অধুনা এর সাথে যুক্ত হয়েছে শহরাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাপ ব্যবহার করে স্কুটি বা বাইকে আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত এক বিশাল সংখ্যক যুবা বাহিনী। কোম্পানিগুলি ব্যবসা করছে প্রায় কোনও মূলধন বিনিয়োগ না-করেই। তারা কিন্তু পুরোপুরি উৎপাদন জগতের বাইরে। এমনকী ড্রাইভারদের চারচাকা বা দুই চাকার গাড়ি দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। অফিসের স্থান এবং কর্ম্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগও প্রায় শূন্যের ঘরে। শুধুমাত্র উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি ব্যস্থাপনায় ও জনগণের করের টাকায় চালু থাকা ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নামে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ তৈরী করে নিলেই হল। তারপর সেই অ্যাপে কর্ম্মপ্রার্থীদের যুক্ত করে নাও। আর খদ্দের ধরার জন্য তাঁদের ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পরিষেবার বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দাও। নেটওয়ার্কের দুনিয়ার উপভোক্তাদের এইভাবে যুক্ত করে নাও এবং এইসবই প্রায় মুফতে!

সমাজের বিশাল বেকার বাহিনীর এক অংশ অভাবের সংসারে দু'মুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য ধার-কর্জ্জ করে বা জমি-জমা বিক্রি করে নিজের গাড়ি নিয়ে হাজির অদৃশ্য কোম্পানির দুয়ারে সেই অ্যাপের সুতো ধরে। তারপর-তো শুরু হল জীবন হাতে নিয়ে দৌড়। দৌড় আর দৌড়! জোরে দৌড়াতে পারলে দুই পয়সা বেশী কমিশনের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। আর প্যাসেঞ্জার তুলতে দেরি হলে বা খদ্দেরের বাড়িতে সময়মতো খাবার পৌঁছে দিয়ে তাঁদের রসনার তৃপ্তি করতে না-পারলে রেটিং যাবে কমে। কমিশন এমন-কী চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়বে। তাই উচ্চ মাইনের মধ্যবিত্ত সমাজের স্মার্ট বাবু-বিবিগণ যখন সপ্তাহান্তে বা সরকারি সবেতন ছুটির দিনে বাড়িতে বসেই স্মার্ট ফোনে আঙ্গুল স্পর্শ করে বিরিয়ানী এবং চিকেন কাবাব পৌঁছে দেওয়ার অর্ডার দেন। অতঃপর, ডেলিভারি বয়ের তুরন্ত্ ডেলিভারি করে দেওয়া খাবার গিলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে সুখের দিবানিদ্রার স্বপ্ন দেখতে

থাকেন। অন্যদিকে, আজকের যুগের 'রানারদের' বাইকের স্পিড বাড়িয়ে পড়ি-মড়ি করে ছুটতে হয় অন্য কোনও খাবার প্রত্যাশীর বাড়ির দরজায় কলিং বেল বাজাতে। ওদের যে রেটিং বাড়াতে হবে! ওদের এ-যেন জীবনের দৌড়; এই দৌড়ে দু'টো বাড়তি পয়সা যদি আসে, বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোন তার পথ চেয়ে বসে আছে! আজকের রাণারদের ছুটি নেই। বাইকের জ্বালানি খরচের ভারও বহন করতে হয় তাদের। কোম্পানি-তো কানাকড়িও দেবে না। অন্যদিকে ফুড ডেলিভারির অনেক কোম্পানিতে কিছু গিগার আছে, যাদের কোম্পানির খাতায় রেজিস্ট্রেশন নেই, তাদের মাইনে কমেরও কম। একটি অর্ডার ডেলিভারি করে পাবে ২০ টাকা। মানে সারাদিন রুদ্ধশ্বাসে জীবন বাজি রেখে দৌড়ে মেরে-কেটে দিনান্তে আয় হবে ৫০০ টাকা। তাদের অনেকের বাইক কেনার সামর্থ্য নেই। তাই বেশ কিছু ডেলিভারি বয় সাইকেল চেপে দিনরাত এক করে দৌড়চ্ছে আরও কয়েকটা বেশি অর্ডার নিয়ে খদ্দেরের ঠিকানায় সময়মতো হাজির হওয়ার উদগ্র বাসনায়। ফলে ঘটছে অনেক মর্মান্তিক ঘটনাও।

যে খাবার ব্যাগে ভরে নিয়ে দৌড়ায়, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে-না, ঠিকমতো না-খেয়ে থাকা এই কর্ম্মী-মানুযেরা। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গেলেও তারা অর্ডার সাপ্লাই রিফিউজ করার সাহস দেখায় না। কোম্পানির মুনাফা সচল রাখতে, নিজের জীবন বাজি রাখা নির্ম্মম-নিষ্ঠুর গতির কাছে, কত অসহায় এই বেকার বাহিনীর দল! গিগ প্ল্যাটফর্মের কর্ম্মীদের হতাশা, অবসাদ, মানসিক ক্লান্তি দিন-দিনে বাড়ছে। আগে জ্যোমাটো কোম্পানিতে আট ঘণ্টায় নয়টি অর্ডার ডেলিভারি করলে ডেলিভারি কর্ম্মী ৫০০ টাকা কমিশন পেত। সেই কমিশন প্রথা তুলে দিয়ে আরও মুনাফা করার জন্য সময়ে স্লট বুকিং করতে পারলে ডেলিভারি পিছু কিছু টাকা ধরিয়ে দিচ্ছে সংস্থা। তাই কমিশন ফিরিয়ে আনা ও চালকদের বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানির তরফ থেকে সরবরাহ করার দাবিতে বিশ্বের নানান প্রান্তে ক্ষোভ-বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটতেও দেখা যাচ্ছে। কাজের শর্ত উন্নত করা ও মাইনে বাড়ানোর দাবিতে ইউরোপের উবের চালকদের যূথবদ্ধ হয়ে অ্যাপ বন্ধ করে একযোগে রাইড রিফিউজ করার খবর হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে। এই হৈচৈ-এর পর ইউরোপিয়ান কমিশন গিগারদের সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট স্টেটাস তুলে কোম্পানির কর্ম্মী হিসাবে বিবেচনা করার একটি খসড়া তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে।

কোনরকম বিনিয়োগ না-করেই কোম্পানি প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নাফা ঘরে তুলে নিচ্ছে কাটমানির মধ্য দিয়ে। আবার এর মধ্যে চুরিও আছে। অনেক সময়ই কোনও কারণ না-দেখিয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত টাকা ড্রাইভারদের প্রাপ্য থেকে কেটে নেয় নিয়োগকারী সংস্থা। এই পুকুর চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না গিগ ওয়ার্কাররা, চাকরি নট হয়ে যাবার ভয়ে। সার্ভিসের কাজে যুক্ত চালকদের গাড়ির কোনও ডেমেজ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে, তার দায়ভার নেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবত এইক্ষেত্রে কোম্পানি হাত ধুয়ে ফেলে। সার্ভিস প্রদানকারী কর্ম্মীদের রেইনকোট, পোশাক এমনকী ব্যাগ পর্যন্ত দেয় না কোম্পানি। সবটাই যায় গিগারদের পকেট থেকে। তবুও কম করে ১২-১৩ হাজার 'বাইক সার্ভিস' চলে কলকাতার রাজপথে। তথ্য বলছে, সারা দেশজুড়ে শুধুমাত্র জ্যোমাটোর তিন লাখের বেশী 'সার্ভিস পার্টনার' আছে। বেকারত্বের কী মর্ম্মভেদী জ্বালা!

### গিগ ওয়ার্কারদের অসম লড়াই

২০২২-এর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার সমস্ত ব্লিংকিট হাবের ডেলিভারি শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে ওয়ার্কারদের প্রধান দাবি ছিল, ৫০ টাকা বেস-পে চালু রাখতে হবে। আন্দোলনের চাপে পড়ে ৩০ শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার মিটিংয়ে গুরগাঁওয়ের কর্পোরেট অফিস থেকে কোম্পানির 'পিপল অপারেশন'এর ডিরেক্টর সরাসরি মিটিং করতে আসেন। ওয়ার্কারদের ৫ জন প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘক্ষণ মিটিং করার পর কোম্পানির তরফ থেকে নতুন ইন্সেন্টিভ স্ল্যাবের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয় ৪০ টাকা অব্দি তারা দিতে পারবে। ওয়ার্কারা এই প্রস্তাব মেনে নিয়েই জানায় যে, বেস-পে তোলা চলবে না। দীর্ঘ দর কষাকষির পর মীমাংসা সূত্র না-বেরোনোয় অধিকাংশ হাবের ওয়ার্কার স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে মিটিং থেকে ফিরে যান। কোম্পানি চাপে পড়ে ১লা অক্টোবর রাতে সংশোধিত স্ল্যাবের প্রস্তাব দেয়, যেখানে আরও তিনটে স্ল্যাব যোগ করা হয়। এই সংশোধিত স্ল্যাব তুলনামূলকভাবে ব্লিংকিট ওয়ার্কারদের লড়াইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। অন্তত ৪০ টাকা বেস-পে'র প্রধান দাবি অর্জন না-হলেও, আপসহীন এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে কোম্পানি অর্ডার প্রতি ২৫ টাকা বেস-পে এবং সাথে কিছু টার্গেট পূরণ করলে ৪০ থেকে ৪৬ টাকা অব্দি পাওয়ার সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। এরই সাথে বিশেষ কারণ দেখালে সপ্তাহে একদিন ছুটি, শনি-রবিবার ১০ ঘন্টার বদলে ৯ ঘন্টা কাজ ইত্যাদি নানা অধিকারও শ্রমিকরা অর্জন করেন।

মালিক বোঝে মুনাফা। যেখানে মানবিকতা বা শ্রমিক স্বার্থ দেখার দায় গৌণ। তাই স্ট্রাইক প্রত্যাহার করে শ্রমিকরা কাজে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদায়ী

'কাঁটাপুকুর হাব' খোলার ব্যাপারে কোম্পানি গড়িমসি করতে থাকে। ফলে 'কাঁটাপুকুর হাব'-এর ওয়ার্কাররা কাজে আসলেও, কোম্পানি জানিয়ে দেয়, এই হাব তারা আর খুলবে না। যারা এর পরেও ব্লিংকিটে কাজ করতে চায়, তারা মুচলেকা দিয়ে নিকটবর্তী হাবে কাজে যোগ দিতে পারে। যে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ব্লিংকিটের ডেলিভারি শ্রমিকরা একজোট হয়ে নেমেছিলেন, সম্মিলিতভাবে লড়ে কোম্পানিকে বাধ্য করেছিলেন মাথা ঝোঁকাতে, সুযোগ বুঝে কোম্পানি একটা হাবকে বেছে নিয়ে তাদের নতুন জুলুমের খাঁড়া নামিয়ে আনল। আন্দোলনকারীদের 'শিক্ষা' দিতে এই জঘন্য কাজটি করল তারা। কোম্পানি জানে যে শ্রমিকদের একতা ভেঙে দিতে পারলে, শ্রমিকদের মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য করতে পারলে শুধু ব্লিঙ্কিট বা জোম্যাটো কোম্পানি নয়, সমস্ত কোম্পানির ফায়দা হবে। আর 'কাঁটাপুকুর' হাব সহ ব্লিংকিটের সমস্ত ডেলিভারি শ্রমিকরা জানেন, যে লড়াকু একতার ফলে তাঁরা এই আংশিক জয়লাভ করতে পেরেছেন; সেই একতার জমি ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। যদিও কোম্পানি কোনও আইনের তোয়াক্কা না-করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বার আন্দোলন না থাকার সুযোগ নিয়ে নিজেদের মর্জিমত শ্রমিকদের উপর জঘন্য আক্রমণ নামিয়ে আনছে। উল্টোদিকে ব্লিঙ্কিট, জোম্যাটো, সুইগি সহ সমস্ত অ্যাপ-নির্ভর কোম্পানির শ্রমিকরাই জোট বাঁধছেন, তৈরী হচ্ছেন।

### গিগ ওয়ার্কারদের সামাজিক সুরক্ষা

সরকার বার-বার করে বলে চলেছে, গিগ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চারটি শ্রম কোডের মধ্যে 'Social Security Act ২০২০'-তে গিগ ওয়ার্কারদের সুরক্ষার নিদান দেওয়া আছে। যদিও তার নির্দেশনামার বাস্তব রূপরেখাই বানানো হয়নি। সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি কর্ম্মীদের অধিকারের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। দিনে আট ঘণ্টা কাজ, স্থায়ী কাজ, মাসিক বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর পেনশনের দাবি এবং সফটওয়্যারে যেসব কারসাজি করে মালিকপক্ষ তাঁদের টাকা কমিয়ে দেয়, সেইসব বন্ধ করার দাবি কীভাবে তাঁরা তুলবেন? কারণ, তাঁদের সাথে-তো মালিক পক্ষের মুখোমুখি আলোচনা করার সুযোগই নেই। এখানে মালিক মানে তো একটি অ্যাপ। আর বর্তমান কর্ম্মসংস্কৃতি হল, ''কেউ-তো তোমাকে কাজ করতে বলে নি, পোষালে কাজ কর, নাহলে বাড়ি বসে সপরিবারে না খেয়ে মর।''

শিল্প সম্পর্কিত শ্রম কোড আইনটি মেয়াদি চুক্তিতে চাকরি চালু করতেই আনা হয়েছে। শ্রমিকদের চাকরির যেটুকু সুরক্ষা ছিল তাও তুলে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। দেশে পাকাপাকি স্থায়ী চাকরি বলে আর কিছু থাকবে না, স্বল্পমেয়াদের চুক্তিতে চাকরি হবে। ঐ কোড আইনে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের বা দর কষাকষির কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। এর আগে শ্রমিকদের যেটুকু মৌলিক অধিকার কাগজে কলমে ছিল, তাও তুলে দেওয়া হয়েছে। নয়া আইনে বলা হয়েছে, ইউনিয়নের কর্মকর্তা কারা হবেন, তা মালিক ঠিক করবে! আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের যে নির্দেশিকা রয়েছে তাও এই আইনে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, কোনও কারখানা বা সংস্থায় কর্ম্মীর সংখ্যা ৩০০'র কম হলে সেখানে ছাঁটাই করার জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন হবে না। দেশে বর্তমানে ৮০ শতাংশ শিল্পে কর্ম্মীর সংখ্যা ৩০০ জনের কম। ফলে, এতে বেশীরভাগ শিল্পে ছাঁটাই অবাধ হয়ে যাবে। একেই বলে, 'মালিকের পৌষমাস আর শ্রমিকের সর্বনাশ'।

### পার্টনারশিপের ভাঁওতাবাজি নয়, চাই শ্রমিক স্বীকৃতি

অনলাইন ডেলিভারি কর্ম্মীদের গালভরা নাম পার্টনার বা এক্সিকিউটিভ। তাদের যে চুক্তিপত্র মেনে কাজ করতে হয়, তা'তে পরিষ্কার করে লেখা থাকে– ডেলিভারির কাজ যারা করবেন, তারা স্বাধীন 'পরিষেবা দাতা (ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার)'। নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম অ্যাপের মাধ্যমে সার্ভিস প্রোভাইডারদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্রেতা বা উপভোক্তাদের সাথে। ব্যবসাটা আসলে হচ্ছে ক্রেতা এবং এই ডেলিভারি পার্টনারদের মধ্যে। অ্যাপের মালিকের কাজ হল শুধুমাত্র এই যোগাযোগটিকে সহজতর করা। মালিকের পক্ষ থেকে শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়, একজন ডেলিভারি শ্রমিককে শ্রমিক বা কর্ম্মী হিসেবে কোনও অধিকার দিতে তারা দায়বদ্ধ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রটি কোনদিন চোখে দেখারও সুযোগ পান না গিগ ওয়ার্কাররা। নানান কারণে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত গিগ শ্রমিকদের যন্ত্রণা বাড়ছে। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ম্মীদের পক্ষ থেকে তাদের শ্রমিক স্বীকৃতির প্রশ্নে লড়াই চলছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস অ্যাক্ট ১৯৪৭-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে শিল্প তথা ইন্ডাস্ট্রি বলতে কী বোঝানো হয়। ১৯৭৮ সালে Bangalore Water Supply and Sewerage Board vs. R. Rajappa কেসের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মানদণ্ড হিসেবে ধরে বলা যায়, অনলাইন ডেলিভারি সংস্থাকে শিল্প হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ডেলিভারি পার্টনাররা আসলে সেই শিল্পের শ্রমিক। গিগ ইকোনমি অর্থনীতির জগতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠলেও কোনও কেন্দ্রীয় আইন তৈরী হয়নি। এমতাবস্থায় গিগ ওয়ার্কারদের আইনি

স্বীকৃতির প্রশ্নে লড়াই জোরদার হচ্ছে। তাদের রোজগার কমছে, বাড়ছে যাতায়াতের খরচ। দূষণ এবং হাড়ভাঙা খাটুনির কারণে ডেলিভারি পার্সেন্টরা অসুস্থ হচ্ছেন। দাবি উঠছে, অ্যাগ্রিগেটর কোম্পানিগুলোকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে কেন্দ্র অবিলম্বে আইন তৈরী করুক। 'অল ইন্ডিয়া গিগ ওয়ার্কাস ইউনিয়ন'-এর সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মগুলি কর্ম্মীদের ওয়ার্কার বলে মানে না। কিন্তু তাঁদের মজুরী, কাজের সময়, লোকেশন সহ সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। একতরফা ছাঁটাই করা হয়। তাই মিনিমাম ওয়েজেস থেকে ইএসআই, পিএফের মত বেশী সুরক্ষার দাবি তুলেছি আমরা।

**প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজম**

বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে পাঁচটি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির (GAFAM) দ্বারা, গুগল, অ্যামাজন, ফেসবুক, অ্যাপেল ও মাইক্রোসফট্। নলেজ ইকোনমিকে করায়ত্ত করে অ্যাপ ভিত্তিক একটা প্লাটফর্ম তৈরী করে এবং ভোক্তা ও কর্ম্মীদের সেই নেটওয়ার্কে যুক্ত করে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের জগত থেকে মুনাফা বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির ধনকুবেররা। এদের ওপর কোনও রাষ্ট্রেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। 'অনলাইন-শপিং' জগতের মূল সংগঠনগুলিই হল বিদেশি কোম্পানি। এইসব হর্তা-কর্তারা তাদের মুনাফার একটা বড় অংশ বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে ওয়ার্কারদের দুর্দ্দশা বাড়ার সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই প্লাটফর্ম অর্থনীতির মালিকরা শ্রমিককে শ্রেণী হিসেবে কোনভাবেই সংগঠিত হতে দেবে না। তাদের 'শ্রেণী পরিচয়' মুছে দিয়ে একক ব্যক্তি মানুষে পরিণত করার প্রবল বাসনায় এগিয়ে চলেছে। শ্রমিক শ্রেণীর যূথবদ্ধতা, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধকে নষ্ট করে এবং একই সাথে পরিবারকে ভেঙে দেওয়ায় আগামীদিনে শ্রমিকশ্রেণী, স্থায়ী শ্রমিক, এইসব শব্দগুলো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে। বরং যে-দিকে এগোচ্ছে তা'তে করে অদূর ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্ম্মীরাও গিগ ওয়ার্কারে পরিণত হয়ে এক দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা ভোগ করবেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক-পুঁজি ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ফিনান্স-পুঁজি উৎপাদনের জগৎ থেকে কোনও রিয়েল ভ্যালু তৈরী করতে না-পেরে আজ 'ফিকটিশাস ক্যাপিটালে' পরিণত হয়েছে। পুঁজির অন্ধগতিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত কম মজুরীতে চুক্তিভিত্তিক গিগ ওয়ার্কারদের জন্ম দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি এই কাল্পনিক পুঁজিকে রিয়েল করার মরিয়া প্রচেষ্টায় তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমকে নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে লুঠ করে নয়া-নয়া বিনিয়োগ ও মুনাফার উদ্দ্যেশ্যে জল-জঙ্গল-জমি, পাহাড়, নদী, সবকিছুকেই নিঃশেষ করছে। ফলে দিনে-দিনে বিপাকীয় ফাটলের রেখা দীর্ঘতর হচ্ছে এবং মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভোগবাদ-সর্বস্ব ব্যক্তিমানুষে পরিণত করা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বজনীন মানবিকতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ পরিচয়কে। 'পুঁজির সাথে প্রকৃতির' এই দ্বন্দ্বকে শ্রমিক শ্রেণীর টিকে থাকা আগুয়ান অংশ ও নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি আত্মস্থ করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করবেন, শ্রমিক-কর্ম্মচারী তথা খেটে খাওয়া মানুষ এবং সমাজ প্রগতির পক্ষে তত মঙ্গল। আজকে একদিকে যেমন সমস্ত ঠিকা, পরিযায়ী ও প্ল্যাটফর্ম জগতের কর্ম্মীদের নিয়ে সংগঠিত লড়াই গড়ে তুলতে হবে, পাশাপাশি বিনষ্ট করে দেওয়া প্রকৃতি পরিবেশের মেরামতির দাবিতে আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের আঙিনায় মিলতে হবে কৃষক, শ্রমিক ও সমস্ত কর্ম্মীদের। এটাই আজকের সময়ের বাস্তব দাবি।

## গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠন সমন্বয় (CDRO) এর প্রতিবেদন ভুয়া এনকাউন্টারে মাওবাদীদের হত্যা বন্ধের আহ্বান

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী'র সদম্ভ ঘোষণা– ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদী মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে যে নিষ্ঠুর হত্যা লীলা শুরু করেছে, দেশের নাগরিকদের হত্যার বিরুদ্ধে ভারতের মানবাধিকার রক্ষার সংগঠনগুলির সম্মিলিত আবেদন:

**প্রেস বিবৃতি: ৮ই জুন ২০২৫ (বাংলা অনুবাদ)**

ভুয়ো এনকাউন্টার করে মাওবাদীদের হত্যার পরিবর্তে আদালতে হাজির করার দাবি—

এক বছরেরও বেশী সময় ধরে ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। 'অপারেশন কাগাড়' (Operation Kagar) এর নামে ২০২৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০০ জনেরও বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই আদিবাসী।

আদিবাসীদের অবিরাম বিরোধিতা সত্ত্বেও ছত্তিশগড়ের জমি খননের জন্য সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাওবাদীরা সবচেয়ে বড় বাধা প্রমাণিত হয়েছে। আর তারাই এখন সশস্ত্র বাহিনীর লক্ষ্য। মাওবাদী এবং তাদের দাবিকে একটি

রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করে তাদের সাথে সংলাপে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে, সরকার মাওবাদীদের দ্বারা ঘোষিত একতরফা যুদ্ধবিরতি বাতিল করেছে। সাম্প্রতিক তথাকথিত এনকাউন্টার হত্যাকাণ্ডের দিকে তাকালে সরকারের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জানুয়ারি, ২০২৫-এ, একটি তথাকথিত এনকাউন্টারে সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চলপতি নিহত হন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ পোষ্ট করে বলেছিলেন, ''আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী একটি নকশাল-মুক্ত ভারত গড়ার দিকে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। সিআরপিএফ, এসওজি ওড়িশা এবং ছত্তিশগড় পুলিশ ওড়িশা-ছত্তিশগড় সীমান্তে একটি যৌথ অভিযানে ১৪ জন নকশালকে নিষ্ক্রিয় করেছে।"

এপ্রিল মাসে, ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার লালপানিয়া এলাকার লুগু পাহাড়ে বিবেক, আরও দুই শীর্ষ মাওবাদী নেতা আরও পাঁচজন সহ, CRPF কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন (কোবরা) এবং ঝাড়খণ্ড জাগুয়ারের একটি যৌথ দলের সাথে গোলাগুলিতে নিহত হন।

গত পনেরো দিনে, মাওবাদীদের কয়েকজন শীর্ষ নেতা সহ বেশ কয়েকজন মাওবাদী ক্যাডার তথাকথিত এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সিপিআই (মাওবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু আছেন। বস্তারের ইন্সপেক্টর জেনারেল সুন্দররাজের মতে, আবুঝমাড়ে ৭২ ঘণ্টা ধরে তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে বাসবরাজু সহ ২৭ জন মাওবাদী নিহত হন এবং ''অভিযানের সময় বিপুল সংখ্যক অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল।"

গত তিন দিনে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সাতজন মাওবাদী নেতা নিহত হয়েছেন। ৫ই জুন, তেন্তু লক্ষ্মী নরসিমা চালাম ওরফে সুধাকর নিহত হন। এরপর ৬ই জুন, মাইলারাপু আডেলু ওরফে ভাস্কর নিহত হন এবং সিডিআরও-এর অন্যতম সদস্য সিভিল লিবার্টিজ কমিটি (তেলেঙ্গানা) কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আজ (৭ই জুন) আরও দু'জন মাওবাদী নেতা, বান্দি প্রকাশ এবং পাপা রাও নিহত হয়েছেন। বিজাপুর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার কর্তৃক জারি করা প্রেস রিলিজ অনুসারে, চলমান মাওবাদী বিরোধী অভিযানের মধ্যে শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে সন্দেহভাজন পাঁচজন মাওবাদীর, যাদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছেন, আরও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে, পুলিশ দুই AK-47 রাইফেল এবং বিস্ফোরক সহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের দাবি করেছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের একটি সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, ''কিছু নিরাপত্তা কর্ম্মী সাপ কামড়ানো, মৌমাছির হুল ফোটানো, ডিহাইড্রেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্র-সম্পর্কিত কারণে সামান্য আহত হয়েছেন, তবে আহত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল এবং তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।"

সিডিআরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই সমস্ত এনকাউন্টারগুলি সাজানো এবং ভুয়া। অন্যথায় কী-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কয়েক ঘণ্টা, কখনও কখনও কয়েক দিন ধরে তীব্র গোলাগুলি হয়েছিল, প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু কেবল মাওবাদীরাই নিহত হয়েছিল, যখন সশস্ত্র বাহিনীর কর্ম্মীরা কেবল সাধারণ ক্ষেত্র-সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগেছেন, যেমনটি পুলিশ স্বীকার করেছে?

এই তথাকথিত এনকাউন্টারগুলি অসাংবিধানিক এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের লঙ্ঘন হয়। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আর এম লোধা এবং বিচারপতি আর এফ নরিম্যান-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ মত দিয়েছিল যে, ''যদি উল্লিখিত টিপ-অফ বা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এনকাউন্টার হয় এবং পুলিশ দল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং এর ফলে মৃত্যু ঘটে, তবে সেই বিষয়ে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হবে এবং কোডের (CrPC) ১৫৭ ধারার অধীনে তা আদালতকে বিলম্ব না-করে জানানো হবে।" বিচারকরা আরও বলেছিলেন যে ঘটনার বা এনকাউন্টারের একটি স্বাধীন তদন্ত সিআইডি বা অন্য কোনও থানার পুলিশ দল কর্তৃক একজন সিনিয়র কর্ম্মকর্তার (কমপক্ষে এনকাউন্টারে নিযুক্ত পুলিশ দলের প্রধানের থেকে এক স্তর উপরের) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

উক্ত রায় তদন্তকারী দলকে অনুসরণ করার জন্য পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে তদন্ত বা অনুসন্ধানকারী দল, ন্যূনতমভাবে, ভিকটিমকে শনাক্ত করতে, রক্তের দাগযুক্ত মাটি, চুল, তন্তু এবং সুতা সহ মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত প্রমাণমূলক উপাদান পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে, ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের শনাক্ত করতে এবং তাদের বিবৃতি (সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্ম্মীদের বিবৃতি সহ) সংগ্রহ করতে এবং মৃত্যুর কারণ, ধরণ, স্থান ও সময় এবং যে কোনও ধরণ বা অনুশীলন যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে তা' নির্ধারণ করতে চেষ্টা করবে। শীর্ষ আদালত আরও বলেছিল যে পুলিশি গুলিতে মৃত্যুর সমস্ত ক্ষেত্রে CrPC এর ১৭৬ ধারার অধীনে একটি ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল তদন্ত অবশ্যই করা উচিত এবং কোডের ১৯০ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার একটি প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পদ্ধতিগুলির

কোনটিই অনুসরণ করা হয়নি, যা' সুপ্রিম কোর্টের রায়ের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

এভাবে, সিডিআরও বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু এবং জ্ঞান সুধার ২০১১ সালের বক্তব্যকে সমর্থন করে যে, এই ভুয়া এনকাউন্টারগুলি ''আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিদের দ্বারা ঠাণ্ডা মাথার, নৃশংস হত্যাকাণ্ড'' ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছত্তিশগড়ের অ্যাডভোকেট জেনারেল অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে জমা দিলেও যে ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর নিহত মাওবাদী নেতার দেহ তার আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হবে, ছত্তিশগড় রাজ্যের যন্ত্রপাতি নিহত মাওবাদী নেতার দেহ তার আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করেনি এবং এইভাবে তার আত্মীয়দের দ্বারা সম্মানজনক শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে বাধা দিয়েছে। এটি আমাদের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ এবং বেলা ভাটিয়া কর্তৃক উল্লিখিত অনেক আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হয়েছে।

আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, পুলিশ এর আগে ১০ জন মাওবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে গত ৩ দিনে নিহতরাও রয়েছেন। এখনও পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন বিভাগীয় কমিটির সদস্য রামন্না, জাতীয় উদ্যান এলাকা কমিটির সম্পাদক দিলীপ, দণ্ডকারণ্যের এলাকা কমিটির নারী সম্পাদক সিতু এবং জাতীয় উদগ এলাকা কমিটির সদস্য সুনীতা, মহেশ এবং মুন্না। আমরা আশঙ্কা করি যে, এই নেতাদের আদালতে হাজির না-করা হলে, তাদেরও একইভাবে সাজানো এনকাউন্টারে systematically নির্ম্মূল করা হবে।

সুতরাং, সিডিআরও নিম্নলিখিত দাবিগুলো জানাচ্ছে—

১. গ্রেপ্তারকৃত মাওবাদীদের অবিলম্বে আদালতে হাজির করতে হবে।

২. এই তথাকথিত এনকাউন্টারগুলির তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে।

৩. বিচার বিভাগীয় তদন্তের অংশ হিসেবে নিহত মাওবাদীদের মৃতদেহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আর-একটি ময়নাতদন্ত করা যায়।

৪. সরকারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নিহতদের মৃতদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

৫. ভুয়া এনকাউন্টারের এই সংস্কৃতি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

৬. গণতান্ত্রিক অধিকার কর্ম্মী এবং সাধারণ মানুষকে অবাধ চলাচল করার অনুমতি দিতে হবে এবং মাঠের বাস্তবতা মূল্যায়ণে সক্ষম করতে হবে।

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ, জল, বন এবং ভূমি, মূল্যবান খনিজ সম্পদ দেশীয় এবং বিদেশী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

**সিডিআরও-এর সদস্য সংগঠন সমূহ:**

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (এএফডিআর, পাঞ্জাব); অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (এএফডিআর, হরিয়ানা), অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (এপিডিআর, পশ্চিমবঙ্গ); আসানসোল সিভিল রাইটস অ্যাসোসিয়েশন (পশ্চিমবঙ্গ); বন্দি মুক্তি কমিটি (পশ্চিমবঙ্গ); সিভিল লিবার্টিজ কমিটি (অন্ধ্রপ্রদেশ); সিভিল লিবার্টিজ কমিটি (তেলেঙ্গানা); কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (মহারাষ্ট্র); কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (সিপিডিআর তামিলনাড়ু); কো-অর্ডিনেশন ফর হিউম্যান রাইটস (মণিপুর); মানাব অধিকার সংগ্রাম সমিতি (আসাম); নাগা পিপলস মুভমেন্ট ফর হিউম্যান রাইটস; পিপলস' কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস (জম্মু ও কাশ্মীর); পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোরাম (কর্ণাটক); ঝাড়খণ্ড কাউন্সিল ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (ঝাড়খণ্ড); পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল রাইটস (হরিয়ানা), ক্যাম্পেইন ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন মণিপুর, দিল্লি; জনাকীয় মানুষ্যাভাকাশা প্রস্থানম, কেরালা।

## নাগরিকপঞ্জির পথে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা

শর্মিষ্ঠা রায়

২০১৯ থেকে দেশব্যাপী এন আর সি করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এন পি আর-এর কাজ শেষ করে এন আর সি করা হবে। সেই সময় দেশজোড়া প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে সরকার পিছু হঠে ও কোভিড প্রোটোকল তাকে মুখ লুকোবার জায়গা করে দেয়। সেই প্রকল্প এবার বিহার বিধানসভার নির্বাচনের আগে বিস্ফোরণের আকারে নামাল কেন্দ্রীয় শাসকদল, অর্থাৎ বিজেপি।

ভোটার তালিকা সমীক্ষা হয়। বিহারে শেষবার এই সমীক্ষা হয়েছিল ২০০৩ সালে। ২৪ বছর বাদে এই সমীক্ষা! এত দিন বাদে মনে পড়লো সরকারের! আর তিন মাস বাদে বিহারে বিধান সভা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন বলছে এক মাসের

মধ্যে এই সমীক্ষা সম্পন্ন করবে। এই কাজ সম্ভব! কম-বেশী এক কোটি ৫০ লক্ষ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছতে হবে নির্ব্বাচন কমিশনের কর্ম্মীদের। এই কাজ সম্ভব!

নির্ব্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নিবিড় শুদ্ধিকরণ বা স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ রিভিশন নাম দিয়ে তারা আসলে যে কাজটা করতে চাইছে, তা' হল বিহারের প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া। এই ভোটাররা কারা? বিহারের মত জাতপাতে বিভক্ত রাজ্যে এদের বেশীর ভাগটাই গরিব, অতি গরিব ও দলিত এবং অতি দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা ব্রাহ্মণ্যবাদী জমিদার ও ভূস্বামীদের প্রাইভেট আর্মিগুলোর দ্বারা বারেবারে ধর্ষিত, লাঞ্ছিত হয়েছে, এদের গ্রাম জ্বালিয়ে বারেবারে গণহত্যা চালিয়েছে রণবীর সেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনার দল। এরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। এবার ধর্ম্মীয় পরিচয় ভুলে এই সমস্ত গরিব মানুষদের ভোটাধিকার সহ নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি। যাতে ডিলিমিটেশন করে নিজেদের জয় পাকা হয়, এবং কর্পোরেটের দাসশ্রমিক জোগানের কাজও হয়।

এখানে একটা দুই পাতার ফর্ম দিয়েছে নির্ব্বাচন কমিশন। তার ভাষা ইংরাজি। আমাদের মনে আছে, এই কয়েক দিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, ইংরাজি বললে না-কী লজ্জা পেতে হবে। ইংরাজি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি, তখন বিহারের মত রাজ্যে, যেখানে শিক্ষার হার যথেষ্ট কম, সেখানে SIR এর ফর্ম ইংরাজি হওয়ার কারণ কী? সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ ওই ফর্ম এর মানে বুঝতেই পারবে না। অর্থাৎ, এই ফর্ম পূরণ করতে অন্যের সাহায্য নিতে হবে, তাতে টাকা খরচ করতে হবে, এবং তথ্য আদান-প্রদানে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বাড়বে, বে-নাগরিক করার সুযোগও বাড়বে। এটাই আমাদের আশঙ্কা।

অদ্ভুতভাবে, এবার মানুষকে বে-নাগরিক করার দায়িত্ব নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন তার নিজের এক্তিয়ার ভুলে বিজেপির অফিসে পরিণত করেছে নিজের অফিসকে। যেখান থেকে পরিচালিত হচ্ছে ডি-ভোটার তৈরীর প্রক্রিয়া। ভোটার হওয়ার প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্রগুলির তালিকা থেকে ভোটার পরিচয়পত্র, আধার, মনরেগা কার্ড এবং রেশন কার্ডের মত নথিগুলি, যেগুলো সকলের কাছে থাকে, তা' নির্ব্বাচন কমিশন বাদ দিয়েছে। তার বদলে এমন ১১ টি নথি চাওয়া হয়েছে যা বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে বিহারের মত একটি রাজ্যে। আমরা আশঙ্কা করছি, পশ্চিমবঙ্গেও এমন কিছু চাওয়া হবে, যা অধিকাংশ মানুষই দিতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন এ ২০২৬-এর এপ্রিল-মে'তেই হয়তো হবে। এই জুলাইতেই এই তালিকা সমীক্ষা নোটিশ পড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় এই সমীক্ষ হয়ে ছিল ২০০২ সালে। এবার ২৫ বছর পর এই সমীক্ষা হবে।

**কোন কোন নথি চাওয়া হল?**

১। কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কর্ম্মচারী/অবসর ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া পরিচয়পত্র/ পেনশন দেওয়ার আদেশপত্র।

২। সরকার/স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ/ব্যাংক/ডাকঘর/জীবন বিমা/ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দেওয়া ১.৭.১৯৮৭ তারিখের আগের যে কোনও পরিচয়পত্র/শংসাপত্র/নথি।

৩। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের ইস্যু করা জন্মের শংসাপত্র।

৪। পাসপোর্ট।

৫। স্বীকৃত বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন/শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র।

৬। উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের ইস্যু করা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শংসাপত্র।

৭। জঙ্গলের অধিকারের শংসাপত্র।

৮। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের ইস্যু করা ওবিসি/তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি বা অন্য কোনও বর্ণের শংসাপত্র।

৯। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (যেখানে প্রযোজ্য, বিহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

১০। রাষ্ট্রীয়/স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তৈরি পারিবারিক রেজিস্টার।

১১। সরকারের জমি/বাড়ি বরাদ্দ করার শংসাপত্র।

বিহারের গ্রামে-গ্রামে গরিব মানুষ আওয়াজ তুলেছেন, এই নথির কোনোটাই তাদের কাছে নেই। তারা দেখাতে পারেন কেবল আধার কার্ড। বিহারের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশেরও কম যেখানে মাধ্যমিক পাশ, সেখানে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটও দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, ঘোষণা মতে আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়। হিসেবনিকেশ বলছে, এই প্রক্রিয়ায় বিহারে ডি ভোটার হয়ে যাবেন প্রায় তিন কোটি মানুষ। এর অর্থ গরিব, দলিত, পিছড়ে বর্গের মানুষদের 'নেই' করে দেওয়ার পরিকল্পনায় নির্ব্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে নেমেছে সরকার।

মানুষের ক্ষোভের আঁচ কিন্তু টের পেয়ে সামান্য পিছু হঠার ভান করছে নির্বাচন কমিশন। বলা হয়েছে, নথি না-দিতে পারলে সমস্যা নেই, বিএলওরা এবং অন্য সামাজিক মুরুব্বিরা

এদের সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিলেই হবে। এইখানে একটা জিনিস স্পষ্ট, এই মুরুব্বিরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই শাসক দলের লোক হয়, এবং এই সার্টিফিকেট টাকার বিনিময়েই হয়। আর এরকম সুযোগ পেলে যে রাজ্যে এনারসি হবে সেই রাজ্যের শাসকদল দু'হাত তুলে এনারসিকে সমর্থন করবে। এমনভাবে এক ঢিলে অনেক পাখি মারার চেষ্টা করল নির্ব্বাচন কমিশন।

এরপরের শিকার পশ্চিমবঙ্গ। বিহারের বিরোধী দলগুলোও তাদের মত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও দলমত নির্বিশেষে এই ভয়াবহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ লড়াই আক্ষরিক অর্থেই মরণবাঁচন লড়াই।

**প্রতিবেদন**

## উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ২ নং ব্লকের শ্রীনাথপুর এলাকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ চাষ করা জমির পাট্টার জন্য কৃষকদের আন্দোলন

অর্ঘ্য মিত্র

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ২ নাম্বার ব্লকের শ্রীনাথপুর এলাকার কৃষকরা বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চাষ করে আসা জমিতে পাট্টার দাবিতে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছে। তারা এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য শ্রীনাথপুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটি বানিয়েছেন। শ্রীনাথপুর চা বাগানের মালিক কৃষকদের জমি থেকে বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করার জন্য মিথ্যা কেস দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে হেনস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কৃষকরা বহুবার মিছিল সহকারে মিথ্যা কেস প্রত্যাহার ও পাট্টার দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলাশাসকের সাথে দেখা করতে চেয়েও দেখা পায়নি। জেলা স্তরের বিভিন্ন অফিসার তাদের ডেপুটেশন নিলেও জমি পাট্টার বিষয়ে কোন মীমাংসা হয়নি। উল্টে ১৬৩ ধারা জারি করে কৃষকদের চাষ করা বন্ধ করে দিয়েছে। চরম আর্থিক দুর্দশায় কৃষক পরিবারগুলো পথে বসার মুখে। এপিডিআর প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন করে এসেছে। আইনি সহায়তাও করছে।

এই অবস্থায় গত ২৩ শে জুন, ২০২৫, শ্রীনাথপুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটি উক্ত জমিতে পাট্টার দাবিতে রাস্তা অবরোধ কর্ম্মসূচী নেয়। শামুকতলা থানার পুলিশ কৃষকদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে ও কৃষকদের মিছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে ব্যারিকেড করে। এই কর্ম্মসূচী সম্পর্কে পুলিশ ফোন করে এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখা সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্র-কে জানায়। কৃষকরা যাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ না-করে এটা কৃষকদের বোঝানোর জন্য পুলিশ এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখার কাছে সহযোগিতা চায় এবং একটা সমঝোতা করিয়ে দিতে বলে। এপিডিআর আলিপুরদুয়ার শাখা যেহেতু কৃষকদের পাট্টার দাবিকে গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে মনে করে এবং তাঁদের সমর্থনে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্ম্মসূচী নিয়েছে, তাই পুলিশ সমঝোতার জন্য এপিডিআর এর কাছেই সহযোগিতা চায়। এই আহবানে সাড়া দিয়ে এপিডিআর নেতৃত্ব এসে যখন কৃষকদের পাট্টার দাবির ন্যায্যতার পক্ষে কথা বলে এবং জেলাশাসকের সাথে কৃষকদের দেখা করানোর কথা বলে, তখন বিশেষভাবে শামুকতলা থানার ওসি জেলাশাসকের সাথে দেখা করানোর আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু হঠাৎ ভোল পাল্টে কৃষকদের মিছিল থেকে মহিলা ও শিশু সহ ১২ জন কৃষককে গ্রেফতার করে। এপিডিআর সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্রকেও বহুক্ষণ পুলিশি ঘেরাটোপে আটক করে রাখে। কিন্তু লাগাতার কৃষক বিক্ষোভ এবং এপিডিআর সহ নগরবাসীর চাপে বিকেল বেলায় সমস্ত কৃষককে পি আর বন্ডে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

অদ্ভুতভাবে ২৯ শে জুন, ২০২৫, রাজ্যের প্রাচীনতম মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর তিন জন পদাধিকারীকে অর্ঘ্য মিত্র (সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার শাখা এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য), রাহুল চক্রবর্তী (সহ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী) ও মানবেন্দ্র নারায়ণ ধর (কার্য্যকরী কমিটির সদস্য, আলিপুরদুয়ার শাখা) একাধিক মিথ্যা কেস দিয়ে শামুকতলা থানা সমন পাঠায়। শামুকতলা থানার এই ধরণের কাজ আবার প্রমাণ করলো পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজও পুলিশি হামলার মুখে পড়ছে। আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের মানবাধিকার কর্ম্মীদের এইভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এক নজিরবিহীন ঘটনা। এর বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ও সংগঠনকে সর্ব্বাত্মক প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

### এপিডিআর-এর দাবি

১. এপিডিআর-এর তিনজন সদস্যের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানার দায়ের করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

২. শ্রীনাথপুর কৃষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৩. আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক (সরকার)কে শ্রীনাথপুরের জমিতে কৃষকদের অবিলম্বে পাট্টা দিতে হবে।

## তামান্না'রা বিচার চায়, বিচার চায় কসবা আইন কলেজ এবং আর জি করের তিলোত্তমারা

লেখক: মানবাধিকার কর্ম্মী

নদীয়ার কালীগঞ্জে দশ বছরের তামান্না খাতুন, ২৩শে জুন, ২০২৫, তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া বোমের আঘাতে খুন হয়ে গেল। অপরাধ, তার পরিবার সিপিআইএম দলের সমর্থক। শাসক দলের হাতে বিরোধী দলের সমর্থক পরিবারের শিশু খুনের কিনারা করতে পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তের শুরুতেই টাকা নিয়ে তামান্নার মায়ের কাছে পৌঁছে যায় পুলিশ। মা সাবিনা ইয়াসমিন তা' প্রত্যাখ্যান করেন। সন্তান হত্যার সুবিচারের আশায় আপনাকেও পাশে চায় তামান্নার মা।

কলকাতার কসবায় ল কলেজে ২৫শে জুন, '২৫, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মহিলা নেত্রীকে ধর্ষণ করে তৃণমূলেরই এক নেতা। মনজিৎ মিশ্রকে সঙ্গ দেয় জাইব আহমেদ, প্রমিত মুখোপাধ্যায়। এই দু'জনেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। এখানে শাসকদলের হাতে শাসকদলের কর্ম্মী চরম নিগৃহীতা। মনজিৎ যথেষ্ট প্রভাবশালী, এর আগেও কলেজের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, ছাত্র এবং ছাত্রের অভিভাবককে মারধরের অভিযোগ জানানো হয়েছিল পুলিশ, কলেজ প্রশাসন, মুখ্যমন্ত্রী, সকলকেই। কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আজ শুধু মনজিতদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পাপের দায় এড়ানো যাবে না। এখন দেখার প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা কতটা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে পারে। সংবাদে প্রকাশ, এফআইআর-এ তিন জনের নাম পরপর থাকা সত্ত্বেও, মনজিতের নাম 'J', জাইবের নাম 'M' এবং প্রমিতের নাম 'P' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন অজানা কারণে নামের আদ্যক্ষরের ক্রম বদল করতে হল, তা' প্রশাসনই বলতে পারবে। মানুষ চায় ন্যায়বিচার। আরজিকর-এর ন্যায় বিচারের লড়াই থেমে যায়নি। ২৪ বছরের যুবতীকে ৩১ বছরের ছেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ষণ করতে পারে, আর তার সহযোগী ১৯ ও ২০ বছরের দুই ছাত্র! বাংলার যুব সমাজের এমন পরিণতি কাম্য ছিল না। আভিভাবক হিসাবে আগামী প্রজন্মকে অতল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবেন না। তামান্না খুনের ও নারী নিগ্রহ ও ধর্ষণের ন্যায় বিচার পাওয়া আমাদের আধিকার।

আর জি কর কাণ্ডে প্রকৃত খুনিদের আড়াল করার লক্ষ্যে সরকার, শাসক দলের নির্লজ্জ মরিয়া প্রচেষ্টা আর-এক-বার গণতন্ত্রের উপর দলতন্ত্রের পাথর চাপা দেয়। সিবিআই এসেও কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি। সারদা, নারদার, শিক্ষা দুর্নীতির মতোই আর জি করের ঘটনাতেও কেন্দ্র রাজ্য আঁতাতের গর্ভে ন্যায় বিচার পাওয়ার সমস্ত আশার অন্তর্জলী যাত্রা সুস্পষ্ট। সরকার ও দলের এই ভূমিকা সাহস যুগিয়েছে শাসক দলের দুষ্কৃতীদের। আর তার শিকার আজকের কালীগঞ্জের তামান্না কিংবা কসবার আইন কলেজের নির্যাতিতা। শাসকের প্রশ্রয়ে সন্দীপ ঘোষ কিংবা মনোজিৎ মিশ্রের মতো অপরাধীরা বেড়ে ওঠে, সুরক্ষা পায়। বিনিময়ে শাসকের রাজ নিশ্চিত করে, দুর্নীতির লাভের ভাগ দেয়। নির্বাচনের আগে বিরোধীদের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার শাসকের দয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

মিটিং, মিছিল, সেমিনার রীতি মাফিক জানানো বা এনওসি দেওয়ার পরেও ভণ্ডুল করে দেওয়া হচ্ছে। নির্ব্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার, পছন্দ মত ভোট দেওয়ার অধিকার শাসকের ইচ্ছাধীন। নির্ব্বাচনে জেতার পরেও হেরে যাওয়া বিরোধীদের উপর আক্রমণ। কলেজের ছাত্রসংসদ নির্ব্বাচন না-করে, শাসকদলের রমরমা এখন নিয়ম। জীবন কেড়ে নেওয়া, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া যেন ছেলেখেলা। সম্পূর্ণ অরাজক, দলীয় দাদাগিরির এক অসহ্য কুশাসন পশ্চিমবঙ্গে। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন ও শাসকদলের সব রকম অগণতান্ত্রিক বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় আওয়াজ তুলতে হবে। তামান্নারা যাতে বিচার পায়, আইন কলেজের নির্যাতিতা সহ সকল নির্যাতিতা যেন বিচার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

শুধু কোর্ট-কাছারি তা' দেবে না, মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই কেবল তা' পারে। বিরোধী দলের কর্ম্মসূচীতে, দাবিতে গণতন্ত্র রক্ষার দায় যতটা উপস্থিত তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকট নিছক ক্ষমতা দখলের ভোটসর্বস্ব নীতি। তাই আজ গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ মানুষকেই নিতে হবে। অধিকার রক্ষার দাবিতে রাস্তায় নেমে জোটবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ। আধিকার রক্ষার সংগঠন এপিডিআর এই বিষয়ে প্রতিবাদের পথে চলতে চায়। আপনাদের সঙ্গে পেলে সরকার হৃত অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। সংগঠন APDR এই বিষয়ে প্রতিবাদের পথে চলতে চায়।

## সুন্দরবনের জীবন

তাপস মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে জলের খাড়ির মধ্যে জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপ গোসাবা। শুনলেই গা ছম-ছম করে ওঠে। প্রত্যন্ত সেই সুন্দরবনে বহুদিনের বাসিন্দা ছাড়া এখানে বসবাস করা একসময় প্রায় অসম্ভব ছিল। দক্ষিণরায়ের গম্ভীর আওয়াজ শুনেও জীবনকে

বাজি রেখে যারা ওখানে রয়ে গেছেন তাদের অনেকেরই খোঁজ মেলে-না, দক্ষিণরায়ের প্রতিবেশীর মেনু হওয়ার জন্য। কত-যে মা-বোন তাদের স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে ঐ গোসাবার জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে গাছের নীচে পড়ে থাকা ডালপালা, পাতা নিয়ে আর্থিক সংস্থান করে দিন গুজরান করেন, সে-কথা বললে এক মস্ত উপন্যাস হয়ে যাবে।

জয়নগরের যুবক, নাম মিঠুন মন্ডল মানবাধিকার আন্দোলনের কর্ম্মী। সে এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যও বটে। সুন্দরবনের মানুষ তার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। তার বাইকে সাওয়ারি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দু'ধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে খাড়ির দিকে চলেছি। আমাদের শহুরে বাঙালীবাবুদের মৎস্যব্যাঞ্জনা উপভোগ করার জন্য মৎস্যের যোগান দেওয়া মৎস্যজীবীদের খড়-মাটির ঘরে বসে থাকা মিশ-মিশে কালো দাঁড় টানা জাল ফেলা মানুষদের কাছে গন্তব্য আমাদের। এতদিন ভরসা দেওয়া রাজনৈতিক দলের নেতাদের অন্তহীন ভন্ডামীর বাইরে এসে তথাকথিত রাজনৈতিক দলহীন এক তরুণ, যে গণতন্ত্রের ভাবনা, মানবিক অধিকারের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে, তার সংগঠনের সাধ্যমত। সেই অনুযায়ী একের-পর-এক তাদের নিয়ে এলাকায় বাস্তব বিচরণ সেই মানুষদের চোখে যেন এত দিনের অন্ধকার ভেদ করে আলোর বিন্দু দেখিয়েছে। বাইকের পিছনে বসে থাকতে-থাকতে এ-কথায় আমাকে তাড়িত করছে যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া হওয়া সত্ত্বেও এই মৈপিঠ-গোসাবা-সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী, মধু সংগ্রহকারী থেকে শুরু করে পশুপালন করে যারা বংশ পরম্পরায় জীবন ধারণ করেন, তাদের বহিরঙ্গের শত পরিবর্তন আসলেও অন্তরের ভাগ্য বোধহয় সেই প্রপিতামহদের মতোই দক্ষিণরায়েতেই বাঁধা।

এবার মৈপিঠ নয়, গন্তব্যস্থল গোসাবা। কলকাতা সোনারপুর অঞ্চল থেকে ট্রেনে ক্যানিং, পরে দু'টি নদীর খেওয়া পেরিয়ে গোসাবার প্রত্যন্ত অঞ্চল। সঙ্গে দেবু'দা ছাড়াও ঐ অঞ্চলেরই সক্রিয় জনপ্রিয় এপিডিআর কর্ম্মী সর্ব্বরঞ্জন। মৎস্যজীবীদের নিয়ে একটা গ্রামীণ স্কুলে বসার কথা সকালে থাকলেও আমরা সময়ে পৌঁছতে না-পারায় বিকেল ৪'টে-তে তাদের আবার জমায়েত হতে হয়। সত্যিই আমাদের বিলম্ব, সেই মৎস্যজীবীদের কষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। যিনি ওখানকার প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন, সেই স্বপন মন্ডলও পরে শচীন্দ্র মন্ডল তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরলেন। সুভদ্রা, রীতা, দেবপ্রসাদ, মঙ্গল, সুশীল, শিশির, গৌরসহ বেশকিছু মৎস্যজীবী সভায় নানাভাবে স্বপনবাবুর বক্তব্যকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বাস্তবিক করে তোলেন। ওনাদের কথা থেকে যে-যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয় তা' হল– ১) সরকার বা বনদপ্তর থেকে জঙ্গলে যাবার লাইসেন্স বা বি এল সি বংশপরাম্পরায় পাওয়া লোকেরা অনেকেই পাননি। বরং যারা জঙ্গলের বাইরে; শহরে থাকেন, তারা অনেকে পেয়ে জঙ্গলের লোকেদের কাছে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে অর্থপোর্জন করে চেলেছে। এটি অবিলম্বে বন্ধ হওয়ার প্রয়োজন।

২) বনদপ্তর কোর এরিয়া, বাফার এরিয়া চিহ্নিত না-করায়, যখন দক্ষিণরায় তথা বাঘের দ্বারা কেউ আক্রান্ত হচ্ছে, বন দপ্তরে রিপোর্ট করলে তারা কোর এরিয়ায় হচ্ছে বলে এড়িয়ে চলছে। এরিয়া নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব বনদপ্তরের কিন্তু সে সম্পর্কে বনদপ্তর নীরব। এর দাবি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩) বনদপ্তরের নথি অনুযায়ী ২০০৭ সালেও বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এতটা দেখা যায়নি। কেন-না জঙ্গলের উপর নির্ভরতা কমাতে জঙ্গলের বাইরে সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরী করতে সরকার উৎসাহ ও সাহায্য দিত। কিন্তু বর্তমানে তা' উঠে যাওয়ায় অনেকেই ছাগল বা শুকর পালন থেকে সরে এসে জঙ্গলকেই তাদের একমাত্র আর্থিক ভিত্তি মেনে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে জঙ্গলে অনেকের প্রাণ যাচ্ছে কিন্তু সেই অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে বনদপ্তর ক্ষতিপূরণ দিতে টালবাহানা করছে।

মূলত এই বিষয়গুলি নিয়ে মৎস্যজীবিদের পরিবারগুলির বেশীরভাগকে দলমত নির্বিশেষে বসতে হবে। এবং সেগুলি নিয়ে কী কী কর্ম্মসূচী সাধ্য অনুযায়ী করা যায় তার রূপরেখা তৈরী করতে হবে। গোসাবায় এলাকা সহ সুন্দরবনের যে-যে জায়গায় যোগাযোগ আছে সেগুলির মধ্যে সংহতি তৈরী করতে হবে। এপিডিআর-এর জেলা নেতৃত্বের সুন্দরবনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। নিয়মিত কর্ম্মসূচী নিতে হবে। এ-বিষয়ে সর্ব্বরঞ্জন ও দেবু'দা সম্মত হয়েছেন।

## এপিডিআর: জেল পরিদর্শন
## বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার

রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে নিজেকে সচল রাখতে চেষ্টা করেছে। এই মুহূর্তে দেশের জেলগুলিতে ধারণ ক্ষমতার চেয়েও বন্দির সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে আছে। জেলের বন্দি দশা মানবিকতা চূড়ন্ত সীমাকেও লঙ্ঘন করে গেছে। রাজনৈতিক বন্দিদের দশাও তথৈবচ। এই পরিস্থিতি এবং বন্দিদের দুর্দশার কথা বিবেচনায় রেখে ২৪ মে, ২০২৫ তারিখেও আমরা এবার বন্দিদের দশা দেখতে বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়েছিলাম।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য জয়শ্রী পাল, কোয়েলী গাঙ্গুলী ও চৈতালী দাশ বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়েছিলাম। আমরা মূলত রাজনৈতিক বন্দি অর্ণব দাম, ধৃতি রঞ্জন মাহাতো এবং চুনারাম হাঁসদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে চাই, সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষকে এই আবেদন করার কিছু পরে ডি আই বি-র লোক এসে হাজির হয়। তিনি আমাদের থেকে জানতে চান, আমরা কোন সংগঠন থেকে এসেছি, আমাদের পরিচয় এবং আমরা কোথায় থাকি? তারপর তিনি আমাদের একত্রে ছবি তুলতে চান। আমরা ওনাকে আমাদের ছবি তুলতে সম্মতি দিইনি।

আমরা অর্ণবদের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁদের হাল হকিকত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। অর্ণবদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলার সময় ডি আই বি র লোক ভিডিও করতে থাকে। ভিডিও করার ব্যাপারে আমরা তীব্র আপত্তি জানাই এবং ভিডিও বন্ধ রাখতে বলি। ওনাকে এই ভিডিও তোলার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়ে আমরা বলি, বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলাকালীন কখনও ভিডিও করা হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'বস'-এর নির্দেশে তার এই ভিডিও করা। আমরা তার কাছ থেকে 'বস'-এর নাম জানতে চাই এবং বসের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাবো বলে জানাই। আমাদের সঙ্গে অর্ণবরাও এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের মুখে পড়ে ডিআইবি কর্ম্মী ভিডিও করা বন্ধ করেন। পরে কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, কথোপকথনের সব কিছু একসঙ্গে নোট করতে তিনি ভুলে যেতে পারেন, এই কারণে ভিডিও করা। ভাবুন একবার! তিনি মনে রাখতে পারবেন না, সেই জন্য অনৈতিকভাবে এই ভিডিও করা! অর্ণব, ধৃতিরঞ্জন এবং চুনারাম জেলের খাবার, ওষুধ এবং অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। অর্ণব জানায় পড়াশোনার ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। এরপর আমরা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর সঙ্গে দেখা করি।

সুপার এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে আমরা যে নির্দিষ্টি বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাই। ১) জেলে বাংলাদেশী বা রোহিঙ্গা বন্দি আছেন কি-না? ২) ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কতজন বন্দি আছেন? ৩) মহিলা বন্দিদের সঙ্গে শিশু আছে কি-না? ৪) সাধারণ বন্দি ও রাজনৈতিক বন্দি কতজন আছেন? ৫) স্থায়ী চিকিৎসক আছেন কি-না? না-থাকলে প্রয়োজনে বন্দিদের চিকিৎসার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? ৬) সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা কত? ১৪ বছরের ওপর সাজা প্রাপ্ত বন্দি সংখ্যা কত? ৭) ১৪ বছরের বেশী সময় ধরে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জেল কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ডেপুটেশনের বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে উত্তর পেতে গেলে RTI করতে হবে। ১৪ বছরের উপরে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী জামিনের বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে কি? এর উত্তরে সুপার জানান, জেল কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে কিছু করতে পারবে না। district legal cell-এ ব্যাপারটা দেখে। বর্দ্ধমান জেলে একজন বন্দি আত্মহত্যা করেছিল, সে বিষয়ে আমরা সুপারের কাছে জানতে চাই। এ ব্যাপারে তিনি জানান, যুবকটি জেলে আত্মহত্যা করেছে; প্রেম ঘটিত কারণে। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই। আমরা সুপারের কাছে অর্ণব দামের প্যারোলের ব্যাপারে কথা বলি। অর্ণবের প্যারোল না পাওয়ার জন্য তিনি আমাদের দায়ী করেন। তাঁর বক্তব্য, আমরা অর্ণবের প্যারোলের জন্য বেশী হইচই করেছি, এর ফলে মিডিয়াতে ও বেশী প্রচার হয়। অতিরিক্ত প্রচারের জন্য অর্ণবের প্যারোল আটকে যায়। বর্তমানে অর্ণব কবে প্যারোল পাবে? এর উত্তরে সুপার জানান, আগে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হোক তারপর প্যারোলের ব্যবস্থা করা যাবে।

**তথ্যানুসন্ধান**

## তথ্যানুসন্ধান: এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখা

গত ১১ মার্চ, ২০২৫ এ পি ডি আর সোনারপুর শাখার উদ্যোগে ছয় সদস্যের একটা দল নিয়ে সোনারপুরের এক্সোডাস ফিউচুরা নিট প্রাইভেট লিমিটেড গার্মেন্ট কোম্পানি (রামচন্দ্রপুর) যাওয়া হয়।

আমরা কারখানা গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানতেও পারি, কারখানাটিতে ২১ ফেব্রুয়ারি '২৫ থেকে suspension of work চলছিল তাই ওখানকার মহিলা শ্রমিকরা গেটের সামনে ধর্ণায় বসে ছিলেন। সেখানে গিয়ে আমরা জানতে যায়, এক্সোডাস ফিউচারা নিট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সোনারপুরের রামচন্দ্রপুরে সাত বিঘা জমিতে একটি গেঞ্জি কারখানা আছে। ৭০০ মহিলা ২০১১ সাল থেকে কাজ করছেন। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও মহিলাগণ কোম্পানির টার্গেট পূরণ করে আসছেন। কিন্তু তাদের পি এফ এর টাকার হিসাব দেওয়া হয় না। বেসিক-পে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পি এফ এর টাকা কমে যাবে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে মালিকের সাথে শ্রমিকদের লিখিত চুক্তি হয় কিন্তু মালিক চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেনি। উপরন্তু গত ২১-০২-২০২৫ তারিখ থেকে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে এবং

লেবার কমিশনের দপ্তরে আলোচনার সময় মালিক পূর্বের লিখিত চুক্তি করতে টালবাহানা করছে।

কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা তাঁদের ন্যায্য পাওনার জন্য বেশ কয়েক দিন ধরে দিনে, রাতে ২৪ ঘন্টা কোম্পানির গেটে অবস্থান আন্দোলন করছিলেন। এঁদের বেশীরভাগ মেয়েরাই ২০১১ সালে কারখানা শুরুর সময় থেকেই কাজ করছিলেন। এই কোম্পানি ক্রমাগত অমানবিক পরিশ্রমের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে শ্রমিকের উপর। শ্রমিকদের সারাদিন শৌচাগার ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। প্রচণ্ড গরমে পাখার ব্যবস্থা প্রায় নেই। সারাদিনে কাজের বিরতি মাত্র ৩০ মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে বিশ্রাম, খাওয়া শেষ করে সাড়ে ৮ ঘন্টা ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে টার্গেট পূরণ করার পেছনে ছুটতে হয় তাঁদের। তাঁরা বলছেন, প্রতি ১৫ মিনিটে উৎপাদনের টার্গেট গত পাঁচ বছরে চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিনে লাঞ্চের সময় বাদ দিয়ে খিদে পেলে কিছু খাওয়ারও তাঁদের অনুমতি নেই। কেউ বাড়ি থেকে মুড়ি চানাচুর নিয়ে গেলে কারখানার ম্যানেজমেন্ট ডেকে হুমকি দিয়ে বলেন পরেরদিন ধরা পড়লে খাবার নিয়ে নেওয়া হবে। কোনোদিন টার্গেট পূরণ না করতে পারলে তাঁদের নির্দিষ্ট কাজের ঘন্টার থেকেও অতিরিক্ত সময় কারখানায় থেকে টার্গেট পূরণ করে তবে তাঁরা ছুটি পান।

আর জি কর-এর অভয়ার ধর্ষণ ও মৃত্যুর খবর শুনে কারখানার মেয়েরা একদিন কাজ বন্ধ করে মিছিল করে। সেই একদিনের প্রোডাকশন উসুল করার জন্য রবিবারেও কাজ করতে হয়েছিল। সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে চাইলেও মালিক শ্রমিকদের সাথে কোনোরকম আলোচনা না-করে ২১ শে ফেব্রুয়ারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ টাঙিয়ে কোম্পানি বন্ধ করে দেয়।

এরপর থেকে কারখানার মেয়েরা কোম্পানির গেটে অবস্থান চালাচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকারেও তাঁরা কারখানার গেটে বসে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ বাচ্চা সামলে, পরিবারের দায়িত্ব সামলে রাতে আসছিলেন অবস্থানে থাকতে, কেউ সারাদিন বসে আছেন কারখানার গেট এর সামনে।

তথ্যানুসন্ধান করে ফিরে আসার ২ দিন পর এক্সোডাস ফিউচারা নিট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এক আন্দোলন-অবস্থানরত কর্ম্মী আমাদের জানালেন, গতকাল ১৩-০৩-২০২৫ সোনারপুরের অ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশানার অফিস মালিকপক্ষকে দুপুর ১২টায় এবং শ্রমিকদের ৩টেয় আলোচনার সময় দেয়। মালিকপক্ষ শ্রমদপ্তরে আলোচনায় আসেনি। ৩'টের সময় শ্রমিক প্রতিনিধিরা গেলে তাঁদের জানানো হয় যে শ্রম দপ্তর যদি আইন মতো ব্যবস্থা নেয় তাহলে গেঞ্জি কারখানাটি বেআইনি ঘোষিত হবে এবং উৎপাদন বাতিল করে সেটা সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে। তাই, শ্রম কমিশনার তাঁদের থানায় বসে মালিক পক্ষের সাথে আপোষ মীমাংসার উপদেশ দেন। সেই মতো সোনাপুর থানা ১৫.০৩.২০২৫ সকাল ১১ টায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের আলোচনায় ডাকে। এবং সেই সঙ্গে জানায়, ''আপনাদের যারা guide করছে তাদের background ভালো না। ওদেরকে সঙ্গে আনবেন না''। তবে পুলিশের হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে আমরা ১৫.০৩.২০২৫ তারিখ সারাদিন থানার সামনে ছিলাম। ১৫.০৩.২০২৫ সকাল ১০ টা থেকে কারখানার গেটে অবস্থান মঞ্চে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন বলে ঠিক করেছিলেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা এবং তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল ১১টায় সোনারপুর থানায় আলোচনার জন্য আসবে। তাঁদের ধারণা, সেই কর্ম্মসূচী ভেস্তে দিতেই সোনারপুর থানা প্রথমে আলোচনার সময় ১০টা রেখেছিল, তাঁদের জোরাজুরিতে ১১টায় রাজি হয়েছে। প্রায় ৫ ঘণ্টা থানার ভিতর আলোচনার পর শ্রমিকরা বেরিয়ে এলে আমরা তাঁদের সাথে কারখানার গেটে যাই। আমরা জানতে পারি ১৩.০৩.২০২৫ শ্রমিকেরা আলিপুর জেলাশাসকের দপ্তরে একটি দরখাস্ত জমা দিয়েছেন। কিন্তু সেখান থেকে সমাধানের কোনো আশ্বাস পাননি।

সর্ব্বশেষ আমরা জানতে পেরেছি যে মালিক কিছু শর্ত মানলেও বেশীরভাগ শর্ত মানেনি। কয়েকজন শ্রমিকের সাথে শাখার পক্ষ থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়েছে।

**রিপোর্ট**

## রিপোর্ট: এপিডিআর, সোনারপুর শাখা পথসভা

৮ এপ্রিল, ২০২৫, এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি এবং সোনারপুর শাখার উদ্যোগে শিক্ষা দুর্নীতির জন্য দায়ী মন্ত্রী, আমলা এবং শাসক দলের নেতাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে, এস এস সি দুর্নীতির মামলা সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিচারের দাবিতে এবং বিনা দোষে কেড়ে নেওয়া সকলের চাকরী ফেরতের দাবিতে ভ্রাম্যমাণ টোটো প্রচার হয়। জেলা ও শাখার একাধিক নেতৃত্ব ও কর্ম্মীবৃন্দ এই দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

সোনারপুর শাখার সদস্য সরোজ বসু ''বাতিল হওয়া চাকরী ফেরতের'' দাবি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট আসলে শিক্ষকদের চাকরি বাতিল করেনি, যেটা বাতিল করেছে সেটা হল, গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ছেলে

খেলা হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে, চাকরি বিক্রি হয়েছে, তাই গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের পথে হেটেছে। যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করার কাজটি সরকার এবং সিবিআই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করেনি। সিবিআই-এর এখনও তদন্ত চলছে। রাজ্য সরকার বলে দিয়েছে যে, স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বশাসিত সংস্থা এবং এই কথার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার খানিকটা হাত ধুয়ে নিতে চেয়েছে। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াটি পরীক্ষার শুরুর আগে থেকেই সরাসরি সরকারি মদতে চলা প্রায় একটি গোপন পরিকল্পিত দুর্নীতির প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা প্রথমেও ছিল, আজও সেই একই ধারা বজায় থেকছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোর্ট নিরীক্ষণ করেছে যে, বেআইনি কাজকর্ম্ম হয়েছে তা' ইচ্ছাকৃতভাবে আপোষ করা হয়েছে। ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সঙ্গেই আসলে ঠকবাজি করা হলো।

আর-একজন বক্তা বলেন যে, চাকরিহারা ২৫,৩২৭ এর মধ্যে ৮,৩২৪ জন অযোগ্য কথাটার মানে এই নয় যে, বাকি ১৭,০০৩ জন যোগ্য। এই ১৭,০০৩ জন যোগ্য-না-অযোগ্য এটা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। সংবিধানের আর্টিকল ১৪ এবং ১৬ অনুযায়ী এঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া না-হওয়ার দরুণ এঁদের চাকরি খোয়াতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ৩৯ পাতায় দ্রষ্টব্য, "the entire selection process has been rightly declared null and void due to the egregious violations and illegalities, which violated Articles 14 and 16 of the Constitution."। "হাজার'টা দোষী ছাড়া পাক, একজন নিরাপরাধ যাতে শাস্তি না পায়,"—Criminal Justice System এর এই Natural Justice এখানে চলতে পারে না। কারণ, Public Money-তে যে Public Appointment হয় সেখানে স্বচ্ছতাই মূল কথা।

সুপ্রিম কোর্ট রায়ের ৩৯ পাতায় বলেছে, "we are of the opinion that the principles of natural justice cannot be invoked to validate the fraud that has occurred. These principles are not rigid or inflexible; rather, they must be applied with due regard to the specific facts and circumstances at hand." কাজেই "In our opinion, this is a case wherein the entire selection process has been vitiated and tainted beyond resolution," আদালতের এই মতামত আমার বেঠিক বলে মনে হয়নি, তাই, বাতিল হওয়া চাকরি ফেরত নিয়ে একমত হতে পারছি না।

গত ২০ মে, ২০২৫, এ পি ডি আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি এবং সোনারপুর শাখার উদ্যোগে স্বচ্ছ মেধা তালিকা প্রকাশের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালানোর প্রতিবাদে, আন্দোলনকর্ম্মী ও সমাজকর্ম্মীদের বাড়িতে-বাড়িতে বিজেপি কর্ম্মীদের হুমকি ও শাসানির বিরুদ্ধে, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে, পহেলগাঁওয়ে নিরপরাধ পর্য্যটকদের মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত না-করে, দায় স্বীকার না-করে জনগণের মধ্যে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে, উন্নয়নের নামে, মাওবাদী মুক্ত ভারত গড়ার নামে ছত্তিশগড়ের আদিবাসী হত্যা ও পাহাড় জঙ্গল কর্পোরেট হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোনারপুর হরিনাভি মোড়ে একটি পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন শাহানারা খাতুন, আলতাফ আহমেদ, দেবাশিস ভট্টাচার্য, শঙ্কর দাশ এবং জগদীশ সরদার।

## রিপোর্ট: এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

৮ এপ্রিল, '২৫, ২৫৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্ম্মীর চাকরি বাতিলের দাবিতে সোনারপুরে প্রতিবাদী মিছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি ও সোনারপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে।

২৫ এপ্রিল, '২৫ ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্ম্মীদের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখার পথসভা।

৪ মে, '২৫ ডায়মন্ড হারবারে যুদ্ধোন্মাদনা ও যুদ্ধ জিগিরের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল ও টোটো প্রচার।

২০ মে, '২৫ হরিনাভিতে দক্ষিণ ২৪ জেলা কমিটি ও সোনারপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধ বিরোধী পথসভা।

২১ জুন, '২৫ মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় দুষ্কৃতিদের মদতে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় পুলিশি গাফিলতিতে তার বিরুদ্ধে এস পি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ঘটনার আগে, মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় ৭ নং ওয়ার্ডে এক কিশোরকে উল্টো করে ঝুলিয়ে বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়। দু'টি ঘটনারই তথ্যানুসন্ধান করে মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা শাখা। রবীন্দ্র নগর থানায় শাখা থেকে একটা চিঠিও দেওয়া হয়। নিখোঁজ কিশোরের উদ্ধারের দাবিতে।

বর্তমান সময় এপিডিআর এর প্রয়োজন কেন, এবিষয়ে ক্যানিং ও গোসাবা এই দুই জায়গায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

## রিপোর্ট: এপিডিআর, মালদা শাখা

১১ মে, ২০২৫, মালদা জেলার গাজোলের শান্তি লজে অনুষ্ঠিত হল এপিডিআর-এর উত্তরবঙ্গের ১৩তম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা। এই সাধারণ সভার আগে ৪ মে, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে অনুষ্ঠিত হয় এপিডিআর মালদা শাখার সাধারণ সভা। এপিডিআর মালদা শাখার কার্য্যালয়ে ১৫ জন সদস্যর উপস্থিতিতে এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩তম দ্বিবার্ষিক উত্তরবঙ্গ সাধারণ সভার আগের দিন মালদা শহরে মালদা শাখার কার্য্যালয়ে সারাদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২৫ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এই সভায় অংশ নেন। সারাদিন ধরে চলা এই সভা শেষে মালদা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত রাজ হোটেল মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গের সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এপিডিআর-এর একটি প্রকাশ্য সভা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই সভায় এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় প্রমুখ বক্তাগণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও মালদা শাখার তিনজন নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। প্রায় রাত দশটা অবধি চলা এই সভায় এপিডিআর-এর সদস্য, সমর্থকরা ছাড়াও সাধারণ নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন মালদা শাখার সভাপতি নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন উত্তরবঙ্গের সাধারণ সভার প্রস্তুতিতে গাজোল, মালদা শহর, কালিয়াচক সহ বিভিন্ন ব্লকে পোষ্টার লাগানো হয়।

পরের দিন অর্থাৎ ১১মে, রবিবার মালদা জেলার গাজোলে এপিডিআর গাজোল শাখার ব্যবস্থাপনায় সকাল ৯টা থেকে গাজোল ব্লকের শান্তি লজ-এ উত্তরবঙ্গের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো লজ বুকিং, প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া ও অনান্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারি, উত্তরবঙ্গ সাধারণ সভার পোষ্টারে সীমান্ত এলাকার নাগরিকদের ওপর বি.এস.এফ,এর নিপীড়ন বন্ধ করার দাবি দেখে স্থানীয় কিছু বিজেপি কর্ম্মী এই দাবি দেশ বিরোধী, এই অভিযোগ তুলে পুলিশের কাছে আমাদের সাধারণ সভা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানায়। তারপর থেকেই বর্তমান রাজ্য সরকারের পুলিশ তাদের আবদার বজায় রাখতে আমাদের সাধারণ সভা বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে এপিডিআর গাজোল শাখার নেতৃত্বের ওপর চাপ দিতে থাকেন। সেই থানার একজন পুলিশ অফিসার শান্তি লজের মালিককে ফোন করে চাপ দিতে থাকেন এই বলে যে, সাধারণ সভার জন্য নেওয়া হলে লাগানো আমাদের সমস্ত ফ্লেক্স খুলে দিতে হবে। আমাদের সাধারণ সভার জন্য নেওয়া হলের বুকিং বাতিল করে দিতে হবে। বিজেপির সেবা করার জন্য গাজোল থানার পুলিশ এইভাবে অন্যায় চাপ দেওয়া শুরু করে সাধারণ সভার শেষ পর্যায়ে এসে। আমাদের গাজোল শাখার সভাপতি ও সম্পাদক স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিককে জানান, যখন উত্তরবঙ্গের সব প্রতিনিধিরা মালদায় উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন সে সময় এই সভা বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। এই নিয়ে অনেক বিতণ্ডার পরেও পুলিশ এই সভা বন্ধ রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যেতে থাকেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, এই অন্যায় ও বেআইনি চাপকে মোকাবিলা করেই আমরা ১১ মে গাজোলে সাধারণ সভা করবো।

পরের দিন ১১ মে, ২০২৫ সকালে আমরা সকলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহ গাজোলে উপস্থিত হই এবং দলবদ্ধভাবে থানায় যাই। অনেক বচসা, বিতর্কের পরে থানাকে এই সাধারণ সভার অনুমতি দিতে বাধ্য করাই। এই আলোচনার সময়েই পুলিশ স্বীকার করেন স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সভা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা জানার পরে আমরা থানার অফিসারের কাছে তীব্র ক্ষোভ জানাই। আমরা বলি, সারা রাজ্যে যেখানে বিজেপি সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে; শুধুমাত্র মুসলমান এই পরিচয়ের কারণে গোটা রাজ্য এমন-কী সারা দেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন চালিয়ে আসছে, তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে আমাদের পূর্বঘোষিত এই সাধারণ সভা বাতিল করে কোন যুক্তিতে? তারা আমাদের এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না-পেরে অবশেষে সভার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত বাধা, বিপত্তির কারণে আমাদের সাধারণ সভা নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা পরে সকাল ১১টায় শুরু হয়।

সাধারণ সভায় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি শাখা থেকে ৪৭ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্পাদকের উত্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর ১২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেয়। প্রতিনিধিদের আলোচনায় সামগ্রিক রাজ্য ও দেশের পরিস্থিতির সাথে, উত্তরবঙ্গের সীমান্তবাসী মানুষের সমস্যা, নদী ভাঙ্গনে দুর্গতদের সমস্যা, উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও কৃষির সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যাগুলি উঠে আসে। সারাদিন চলার পরে বিকাল পাঁচটায় এই সাধারণ সভা ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়।

১৬ মে, ২০২৫, শুক্রবার ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর কলকাতায় রাজ্য সরকারের পুলিশের নৃশংস সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মালদা শহরের রাজ হোটেল মোড়ে এপিডিআর মালদা শাখার ডাকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মালদা শাখার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শহরের আরও কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রস্তাবিত সারা ভারত শ্রমিক ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মালদা শহরে ১৭ মে, '২৫ AWBSRU আহ্বানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অংশ নেওয়ার জন্য তারা এপিডিআর মালদা শাখাকে আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমরা এই সভায় যোগ দিই। মালদা শাখার সম্পাদক এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রমিক

আন্দোলনের দাবিগুলি ব্যাখ্যা করে, শ্রম-কোড বাতিলের দাবি উল্লেখ করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান রাখেন।

## রিপোর্ট: এপিডিআর, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির ডাকে গোল টেবিল মত বিনিময় সভা

৩১শে মে, ২০২৫, শনিবার দুপুর ২-৩০টে থেকে বহরমপুরের ঋত্বিক সদনের পেছনে সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ভবনের ঘরে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল, ওয়াকফ সংশোধনী আইন, ওয়াকফ আন্দোলন নিয়ে মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি, গণতান্ত্রিক ওয়াকফ আন্দোলনকে ধ্বংস করতে ধূলিয়ান ও সুতি'তে পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক অশান্তি, ৩০০ জনের জেল হেফাজত ও বহু মানুষের ঘরছাড়া, কলকাতায় যুদ্ধ জিগির বিরোধী মিছিলে ও প্রতিবাদীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি-আরএসএস-এর হামলা-হুমকি, ফেসবুকে যুদ্ধ বিরোধী অবস্থানে থেকে মন্তব্য লেখায় ৬৩ জনকে রাজ্য পুলিশের গ্রেফতারী, মুর্শিদাবাদে গোরক্ষা বাহিনীর গণ পিটুনি ও সন্ত্রাস, আগামী ৩১শে জুলাই পর্যন্ত জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার পক্ষে হাইকোর্টের রায়– এই সমস্ত বিষয়ে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে করনীয় কর্ত্তব্য নিয়ে একটি গোল টেবিল মত বিনিময় সভার আয়োজন করে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

উক্ত আলোচনা সভায় বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার নানা প্রান্ত থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণআন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্ম্মীরা এসেছিলেন। প্রত্যেকে জেলার বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় কর্ত্তব্য নিয়ে খোলামেলাভাবে নিজের-নিজের বক্তব্য রেখে সভাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এপিডিআর-এর ডাকে বিভিন্ন কর্ম্মসূচীতে সভার সকলেই সাধ্যমত সহযোগিতা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

## রিপোর্ট: সামশেরগঞ্জে বিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ রাখার বিরুদ্ধে এপিডিআর-এর প্রতিবাদ

১৩ ই এপ্রিল, ২০২৫, থেকে মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত এই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। অথচ গরমের ছুটির পর গত ২রা জুন, ২০২৫, সরকারিভাবে এলাকার সমস্ত বিদ্যালয় খুলে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুল দখল করে থাকার দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারছে না, কোনও ক্লাস করতে পারছে না। শিক্ষক শিক্ষিকারাও অফিস খুলে কিছুক্ষণ থাকার পর স্কুলগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ, শিক্ষকদের ঘরও বাহিনীর দখলে। শামসেরগঞ্জের কৃষ্ণকুমার সন্তোষকুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, ধূলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়, বাণীচাঁদ আগরওয়াল বালিকা বিদ্যালয়, দীঘরি হাই স্কুল এবং ধূলিয়ান হাই মাদ্রাসায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রয়েছে। কাঞ্চনতলা জেডিজি ইনস্টিটিউশনে রয়েছে রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী। বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠন সমস্ত বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার সম্পূর্ণভাবে খর্ব করা হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা, এরকম ভাবে চলতে থাকলে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

নিরাপত্তা বাহিনী সরিয়ে নিয়ে অবিলম্বে স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন শুরুর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি শামসেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও'-কে গত ৫ই জুন, ২০২৫, ডেপুটেশন দেয়।

**দাবি**

১. অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলি থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ বাহিনী সরে গিয়ে এলাকার গ্রামগুলির বাইরে কোথাও ক্যাম্প করে থাকুক। যে-রকম ভাবে বিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের ফিরিয়ে দিক কেন্দ্রীয় বাহিনী।

২. অবিলম্বে সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন শুরুর ব্যবস্থা করা হোক।

৩. ভবিষ্যতে পঠনপাঠন বন্ধ করে স্কুলে বা কলেজে নিরাপত্তা বাহিনী রাখা যাতে না-হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হোক।

৪. এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার খর্বকারি পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

এছাড়াও এলাকার বেশ কিছু ব্যাক্তি ও সংগঠন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাহিনী সরিয়ে নিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু করার দাবি জানায়।

ডেপুটেশনের পর-পরই মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে বাহিনী সরিয়ে নিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে রাখবার কথা ঘোষণা করেন। এপিডিআর এই ঘোষণারও বিরোধিতা করে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে তারা সরব হন। যদিও এখনও পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্যের পুলিশকে তুলে নেওয়া হয়নি। তারা এখনও বিদ্যালয়গুলিকে দখল করে বহাল তবিয়তেই আছে। এর বিরুদ্ধেও এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের নিয়ে প্রতিবাদ কর্ম্মসূচী নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

## রিপোর্ট: এপিডিআর, কৃষ্ণনগর শাখা

২৬ মার্চ,'২৫, তেহট্ট জেলে বন্দি মৃত্যুর ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে এবং জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কৃষ্ণনগর শাখার সদস্য প্রতিনিধিরা।

১০ এপ্রিল, '২৫ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে যুক্ত মন্ত্রী আমলাদের শাস্তি চেয়ে এবং চাকরি হারিয়ে প্রতিবাদে সামিল শিক্ষকদের উপর পুলিশি নির্য্যাতনের প্রতিবাদে পথসভা করে কৃষ্ণনগর শাখা।

১৬ মে, '২৫ কাশ্মীর সীমান্তে অপারেশন সিঁদুর এর নামে সাম্প্রদায়িকতা যুদ্ধজিগির আর দেশপ্রেমের আড়ালে দেশের মধ্যে আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমি কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া, সাম্প্রতিক এই পরিস্থিতিকে উন্মোচিত করে APDR কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে এআইসিসিটিইউ সহ গণ সংগঠন -গুলির যৌথ পথসভার আয়োজন করা হয়।

৩১ মে, '২৫', নিজের সন্তানের রক্তে স্নাত এ-কেমন গণতন্ত্র?' শিরোনামে বিভিন্ন গণসংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ মিছিল ও প্রতিবাদসভা সংগঠিত করে বিনাবিচারে মাওবাদী ও আদিবাসীদের হত্যার প্রতিবাদ জানায় কৃষ্ণনগর শাখা। দাবি তোলা হয় অবিলম্বে অপারেশন কাগার ও অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট বন্ধ করতে হবে।

৬ জুন, '২৫, কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর এলাকায় চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে নির্ম্মম গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কিছু মানুষের বিরুদ্ধে। এই অমানবিক ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তি চেয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানায় APDR— চাপে পড়ে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

**এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।**

## রিপোর্ট: এপিডিআর, নৈহাটি-ভাটপাড়া শাখা

২২শে জানুয়ারি, ২০২৫, কলকাতা বইমেলায় স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে এপিডিআর-কে বুকস্টল করতে না-দেওয়ার প্রতিবাদে এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু বিষয় নিয়ে এলাকার দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হয়।

২রা এপ্রিল, ২০২৫, এপিডিআর-এর দক্ষিণ বঙ্গ সাধারণ সভা সফল করার আহ্বানে দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হয়।

৩রা এপ্রিল, ২০২৫, এপিডিআর-এর দক্ষিণবঙ্গ সাধারণ সভার পোস্টার লাগানো হয় ।

২০শে এপ্রিল, ২০২৫ শিক্ষাক্ষেত্রে লাগামহীন দুর্নীতি সহ কিছু সমসাময়িক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পোস্টার লাগানো হয়।

২৭শে এপ্রিল, ২০২৫, পহেলগামে নিরীহ পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের  নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও এই ঘটনার অজুহাতে যুদ্ধ জিগিরের বিরুদ্ধে, ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ও সামসেরগঞ্জ ও অন্যত্র দাঙ্গা লাগানোর শাসকীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়।

৪ঠা মে, ২০২৫  শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬ই মে, ২০২৫ 'শ্রমকোড' বাতিল, দেশজুড়ে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর আক্রমণ, চাকরি হারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশী হামলা, 'বাংলাদেশী' ছাপ দিয়ে গুজরাট ও উড়িষ্যায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমজীবী মানুষদের ওপর আক্রমণ এমন বহুবিধ বিষয়ের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়।

১২ই মে, ২০২৫, দেশজুড়ে  সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর সার্বিক হামলা, বন্দি মুক্তি, যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি, সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতির মত বহুবিধ বিষয়ে নৈহাটি স্টেশনের সামনে শাখার উদ্যোগে পথসভা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সভা চলে। অনেক মানুষ-ই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্যের অন্য অনেক জায়গার মত নৈহাটি-ভাটপাড়া অঞ্চলে ও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে আচমকা কাউকে কিছু না-জানিয়ে জোর করে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানোর অভিযান সাজো-সাজো রবে শুরু হয়ে যায়। শাখার সদস্যরা স্থানীয় বহু মানুষকে সাথে নিয়ে এর বিরুদ্ধে, নাগরিক উদ্যোগে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মাইকে প্রচার, আপত্তি ফর্ম ছাপিয়ে নাগরিকদের দিয়ে তা' পূরণ করে কয়েক হাজার মানুষের আপত্তি লিপিবদ্ধ করানো, বিদ্যুৎ দপ্তরে একাধিক বার আলোচনা ও ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন লাগাতার চলতেই থাকে। সাধারণ মানুষের

মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে গিয়ে তাদের স্মার্ট মিটার নিতে আপত্তি জানাতে থাকে। মানুষ ভিড় করে আমাদের বক্তব্য শোনেন ও অনেক সময় আগ্রহী মানুষের ভিড় ঠেলে এগোতেই পরবর্তী জমায়েতে পৌঁছতেই দেরি হয়ে যায়। বারবার-ই আমাদের ছাপানো আবেদন পত্র নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন করে আবেদন পত্র ছাপতে হয়।

শেষ খবর, মানুষের আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার আপাতত গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত থেকে পিছোতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু, মানুষের আন্দোলন ও নজরদারী অবশ্যই অতন্দ্রভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার।

**রিপোর্ট: এপিডিআর, হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কর্ম্মসূচী**

১৬-০২-২০২৫ উত্তরপাড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

২৩-০২-২০২৫ চন্দননগর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

২৬-০২-২০২৫ চুঁচুড়া শাখার সদস্য জয়দেব দাসের স্মরণসভা।

০২-০৩-২০২৫ ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

১৬-০৩-২০২৫ চুঁচুড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ।

২৩-০৩-২০২৫ হুগলী জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা।

২৭-০৩-২০২৫ ভাবাদীঘি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে SLP বিষয়ে দিল্লী গিয়ে শ্রী প্রশান্ত ভূষণের সাথে আলোচনা। শ্রী প্রশান্ত ভূষণ আমাদের SLP করতে রাজী হয়েছেন।

৩০-০৩-২০২৫ শ্রীরামপুর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা।

৩১-০৩-২০২৫ দক্ষিণবঙ্গ বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে চুঁচুড়া শাখার পথসভা।

১০-০৪-২০২৫ ভাবাদীঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের সাথে ভাবাদীঘি গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা।

১০-০৪-২০২৫ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আদালতের রায় বিষয়ে শ্রীরামপুরে হুগলী জেলা কমিটির দু'টি পথসভা।

১৩-০৪-২০২৫ চাঁপদানিতে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে রামনবমীর মিছিলের পরে ১১-০৪-২০২৫ তারিখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার তথ্যানুসন্ধান।

১৩-০৪-২০২৫ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিষয়ে শ্রীরামপুর শাখার আলোচনা।

১৫-০৪-২০২৫ চুঁচুড়া থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে বলপূর্ব্বক আটকে রাখার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান।

১৭-০৪-২০২৫ চুঁচুড়া থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে বলপূর্ব্বক আটকে রাখার বিষয়ে চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

০২-০৫-২০২৫ চুঁচুড়া থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে বলপূর্ব্বক আটকে রাখার বিষয়ে চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

০৪-০৫-২০২৫ সাম্প্রতিক বিষয়ে (কাশ্মীরে পর্যটক হত্যা/ ওয়াকফ আইন/নিয়োগ কেলেঙ্কারি/মধ্যপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় গণহত্যা) চুঁচুড়া শাখার পথসভা।

১৭-০৫-২০২৫ চুঁচুড়া থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে বলপূর্বক আটকে রাখার বিষয়ে চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

১৭-০৫-২০২৫ হুগলী জেল হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

১২-০৬-২০২৫ চুঁচুড়া থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে বলপূর্বক আটকে রাখার ও হুগলী জেল হেফাজতে মৃত্যুর বিষয়ে চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান।

০৪/০৭/২০২৫ হুগলী জেলের সুপারিনটেনডেন্টের সাথে দেখা করে হুগলী জেল হেফাজতে মৃত্যু ও জেলের অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

০৪/০৭/২০২৫ কালীগঞ্জে তামান্না খাতুনের হত্যা, দক্ষিণ কোলকাতা ল কলেজের ছাত্রীর পরিকল্পিত ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘণের প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা কমিটির পথসভা।

## কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ১৯ শে এপ্রিল থেকে ৮ই জুলাই ২০২৫

১৯ এপ্রিল, ২০২৫, ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা সভা। কলেজ স্ট্রিট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হল-এ ''কেন আমরা ওয়াকফ সংশোধন আইনের বিরোধিতা করবো'' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন আইনজীবী ঝুমা সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতিন ও এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী।

২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ড সহ দেশজুড়ে মাওবাদী দমনের নামে বিনা বিচারে ও ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা বন্ধ করার দাবিতে, যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে অবিলম্বে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার দাবিতে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রচারসভা।

৩রা মে, ২০২৫, গুজরাট, উড়িষ্যা সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও

বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি মুসলমানদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে নিপীড়ন ও বিতাড়ণ বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ এর দাবিতে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত যৌথ প্রতিবাদ মিছিল। এপিডিআর সমেত বিভিন্ন গণ সংগঠনের উদ্যোগে এই মিছিলটি প্রকৃতই প্রতিবাদী রূপ নেয়।

২২ মে, ২০২৫, যুদ্ধ বিরোধী মত প্রকাশের জন্য পুলিশি মদতে প্রতিবাদী নাগরিকদের বাড়িতে বাড়িতে ও নাগরিক মিছিলে বিজেপি ও আরএসএস দুষ্কৃতীদের হামলা ও হুমকির প্রতিবাদে, ফেসবুকে শাসকের অপছন্দের মত প্রকাশের জন্য গ্রেপ্তার বন্ধের দাবিতে, চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশ ও শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও আন্দোলনের সংহতিতে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে প্রতিবাদ সভা।

২৬ শে মে, ২০২৫, যাদবপুর কফি হাউসের সামনে নাগরিক প্রতিবাদ সভা। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে শান্তি আলোচনা শুরু করার দাবিতে, সিপিআই মাওবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক বাসব রাজ ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে ও জল-জঙ্গল-জমি কেড়ে কর্পোরেটকে দেওয়ার জন্য দেশজুড়ে আদিবাসী উৎখাত ও হত্যা বন্ধের দাবিতে এই প্রতিবাদ সভা হয়।

২রা জুন, ২০২৫, যৌথ প্রতিবাদ সভা। চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশি বর্বরতা ও জমায়েত, মিটিং মিছিল করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে বিভিন্ন গণ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এপিডিআর সামিল ছিল।

১৪ই জুন, ২০২৫, গাজায় ইজরাইল আমেরিকা জোটের গণহত্যা বন্ধের দাবিতে এবং প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ও মুক্তির দাবি, জনতার স্বপক্ষে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ইজরাইলকে ভারত সরকারের সমস্ত ধরনের মদত দেওয়া বন্ধের দাবিতে গাজার অধিবাসীদের রক্ষায় ও প্যালেস্টাইন বাসির জন্য অবিলম্বে ভারত সরকারের সক্রিয় ভূমিকা রাখার দাবিতে ছাত্র ও নাগরিকদের গণ অবস্থান। কলেজ স্ট্রিট বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে এপিডিআর এর উদ্যোগে সাড়া দিয়ে বহু ছাত্র সংগঠন ও গণসংগঠনের প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত থেকে তাদের বক্তব্য রাখেন।

২৫শে জুন, ২০২৫, এপিডিআর এর ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা। বিষয় 'স্বরাজ কথা: বিশ্ব পরিস্থিতি ও গণতন্ত্রের সংকট'। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র। অনুষ্ঠানটি কলেজ স্ট্রিট থিয়োসফি -ক্যাল সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

## মননে ছড়ানো যে বিষ

লেখক: মানবাধিকার কর্ম্মী

নিয়ম এমন হবে যে, সবল দুর্বলকে পায়ের তলায় পিষে দেবে, দুর্বল জাতি নিষ্পিষ্ট হবে সবল জাতির বুটের তলায়, শক্তিশালী দেশ দুর্বলতর প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপরে আক্রমণ চালাবে এবং দরকার হলে সেই দেশকে গায়ের জোরে নিজের অধীনস্থ করবে!

আইন এমন হবে যাতে টাকার জোরে বলীয়ান বড়লোকরা গরীবদের কাছ থেকে সমস্ত হক কেড়ে নেবে আইনসম্মত উপায়েই। নদী অরণ্য পাহাড় বাতাস সবকিছুর ওপরে রাজত্ব করবে অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান অংশ। শান্তি প্রগতি মানবিকতা মানুষের অধিকার– এ সমস্তই নিন্দিত হবে দুর্বল ভেড়ার পালের ন্যাকামো-পূর্ণ মনোভাব আর মানুষকে পিছনপানে টানার অভিসন্ধি হিসেবে।

বুদ্ধির জোরে, ক্ষমতার জোরে, প্রযুক্তির জোরে যুদ্ধাস্ত্রের জোরে কোনও কিছু দখল করার মধ্যে কোন দুর্নীতি নেই। বরং আছে বীরত্ব এবং পুরুষকার। এই কাজে ব্যর্থ হলে তবেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে, এ কাজে সফলদের জন্য দুর্নীতি শব্দটির প্রবেশ নিষিদ্ধ!

যেহেতু শিশু এবং নারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাই তাদের শরীরের ওপর মনের ওপর এবং জীবনের ওপর সবল পুরুষের বা পুরুষালি মনোভাবাপন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের অধিকার চূড়ান্তভাবে ফলানো হবে। এটাই বর্তমানে জনমোহিনী চূড়ান্ত দক্ষিণ পন্থী (Far Right) চিন্তা কাঠামোর নির্যাস!

এখানে সহানুভূতি যদি কোথাও থাকে, যদি কুমীরের চোখ দিয়ে কখনও জলও ঝরে তাহলে তা অবশ্যই যাবে সবলের পক্ষে, সম্প্রসারণের পক্ষে, নিপীড়কের পক্ষে! কখনোই দুর্বল, নিপীড়িতের পক্ষে নয়! এই যে মনোভাব এটা নয়া ফ্যাসিবাদী মনোভাবের এক প্রধান লক্ষণ।

আমাদের গরিব দেশ ভারতবর্ষে এই মানসিকতা সাধারণভাবে আসার কথা ছিল না। এখানে দরিদ্র-লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে মহাপুরুষদের দাঁড়ানোর ঐতিহ্য যুগ যুগান্ত ধরে বিরাজ করেছে। ঘৃণা এবং যুদ্ধ কখনও ভারতবাসীর মনকে গ্রাস করেনি। চিরকাল উল্টোটাই অর্থাৎ ভালোবাসা এবং শান্তির সুরই ভারতীয় মনোভাব হিসেবে বিশেষভাবে বিশ্বজুড়ে চিহ্নিত হয়েছে।

বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে জনবাদী দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দাপট জনমোহিনী রূপে হাজির হচ্ছে এবং তার পেছনে জড়ো হচ্ছে, জড়ো হয়েই চলেছে বিপুল দঙ্গলে জনসমষ্টি। ভারতবর্ষ তার

ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং যেন এক্ষেত্রে সে বিশ্বকে পথ দেখাতে প্রস্তুত।

যৌক্তিক বিবেকি মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা করে ও দূরে ঠেলে এই যে অযৌক্তিক আগ্রাসী বিদ্বেষপূর্ণ অমানবিক সত্তা সমাজকে গ্রাস করছে আমার মনে হয় আজ থেকে ৩৫ বছর আগে যে নয়া অর্থনৈতিক নীতি আমদানি করা হয়েছিল তার সঙ্গে এর সুগভীর সম্পর্ক আছে। স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ বা কাঠামোগত পরিবর্তনের নামে শুধু অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, সুচতুরভাবে তখন থেকেই পরিবর্তন করা শুরু হয়েছিল সামাজিক রাজনৈতিক আইনি কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীরভাবে দেশের মানুষের মানসিক গঠন কাঠামোর পরিবর্তনের। আজ সাড়ে তিন দশক পরে এসে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে।

সেই পরিবর্তন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে খুঁড়ে, চেঁচে নিশ্চিহ্ন করছিল ভারতীয় মননে বিরাজিত বহমানা প্রাণ-ফল্গু, বাতিল করছিল দীর্ঘদিন ধরে অর্জিত, সঞ্চিত, বিকশিত উচ্চ পর্য্যায়ের মানবিক অনুভূতি ও মূল্যবোধগুলিকে। এই নীতি অনুসারে তখন থেকেই শিক্ষা জগৎকেই এমনভাবে পরিবর্তন করা শুরু হলো যাতে নয়া অর্থনৈতিক কাঠামোয় বড় হতে হতে শিশুরা মানিয়ে নিতে পারে– ‘‘জোর যার মুল্লুক তার’’, ‘‘Survival of the fittest’’, ‘‘এ দিল মাঙ্গে মোর’’... ইত্যাদি কর্পোরেট sponsored হৃদয় বীণার মূর্ছনার সঙ্গে।

এই সময় থেকেই বাড়তে থাকল একদিক দিয়ে এক অদ্ভুত ‘‘স্বদেশ প্রীতি’’ যেটার মধ্যে প্রীতির ছিটেফোঁটাও নেই যা আছে তা শুধু বিদ্বেষ। মানুষের প্রতি বিদ্বেষ— কালো মানুষের প্রতি, সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি, আদিবাসী মানুষের প্রতি, উপজাতি মানুষের প্রতি, আধুনিক মানুষের প্রতি, বেশী লেখাপড়া জানা মানুষের প্রতি, ‘‘অপর’’ মানুষের প্রতি সীমাহীন অন্তহীন বিদ্বেষ। আর এই স্বদেশ প্রীতির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল মার্কিন প্রীতি, ফ্যাসিজম প্রীতি, জায়নবাদ প্রীতি, যুদ্ধ প্রীতি।

স্বার্থপরতা, নিজের স্বার্থে সব কিছু করায়ত্ব করা, নিজের উন্নতির রথের চাকার সামনে বাধা হিসেবে দাঁড়ানো সব কিছুকে গায়ের জোরে, পারলে সুপারি কিলার ভাড়া করে নিকেশ করে দেওয়ার মনোবৃত্তি মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মনেও মাকড়সার জাল বিস্তার করতে শুরু করল। কলকারখানা বন্ধ হতে লাগল দ্রুত গতিতে। আরও দ্রুত ক্ষয় পেতে লাগল স্থায়ী কাজের সুযোগ। আর তার চেয়েও অনেক গুণ দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল শেয়ার বাজার, নানারকম ফাটকা আর জুয়া, ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল অর্থনীতির ভার্চুয়াল জগৎ। স্পেকুলেশন আর বেটিং এর জগতে যাবতীয় দ্বিধা সঙ্কোচ সরিয়ে রেখে হুড়হড়িয়ে ঢুকে পড়তে লাগল মধ্যবিত্তরাও। সমাজের মননশীল অনুভূতি শীল, সৃজনশীল, মেধার অনুশীলন করা সঙ্ঘবদ্ধ থাকা মধ্যবিত্ত অংশটা হয়ে পড়তে থাকল একক, বিচ্ছিন্ন, এবং সেই কারণেই একই সঙ্গে বাস্তবে ভীরু ও সেই জন্যই মননে ভীষণ মারকুটে। এটাও নয়া অর্থনীতির প্রবর্তকদের একটি পরিকল্পিত প্রাপ্তি।

এই পটভূমিতে এবার অবধারিতভাবেই শুরু হলো এতদিনকার অর্জিত যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার জগতের প্রস্থান ও অপ্রয়োজনীয় অলীক অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক মায়াজাগতিক অতীতে প্রত্যাবর্তনের আবিল আর্তি। এই চিন্তার কাছে একবার আত্মসমর্পণ করলে যে কোনও নিষ্ঠুর কাজকেই পবিত্র মনে হয়, যে কোনও মিথ্যেকেই গ্রহণীয় করা যায়, যে কোনও অন্যায়কেই ন্যায্যতা দেওয়া যায়। সোনায় সোহাগা হয় যদি তার সঙ্গে ‘উন্নয়ন’ নামক ‘সর্ব পাপেভ্য মোক্ষ দানের’ গীতার বাণীটি সারথী হিসেবে সঙ্গে পাওয়া যায়।

ফলে গত পঁয়ত্রিশ বছরে ‘উন্নয়ন’ বিষমন্ত্রে দীক্ষিত পালে পালে মানুষের দঙ্গল বেড়েছে, বেড়েই চলেছে শুধু আমাদের দেশেই নয় এ সংক্রমণ আন্তর্জাতিক। তাই গাজা হোক বা ছত্তিশগড়ের আদিবাসী গ্রাম-- ভয়ঙ্কর হাতিয়ার পুষ্ট সেনাবাহিনীর আক্রমণে শিশুর মৃত্যুতে চোখের একটি পাতাও কাঁপে না-তো বটেই বরং দু'হাত তুলে খুনীদের বাহবা দেয়; এমন হিংস্র জানোয়ার সদৃশ মানুষ এখন আমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে। দরকার এই মননের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ এই মনন তৈরী করা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধেও।

**টুকরো খবর**

## GDP'র ধাঁধা

জাপানের জনসংখ্যা ১২ কোটির কিছু কম এবং মাথাপিছু জিডিপি ৩৩,৯৬০ ডলার। ভারতে মাথাপিছু জিডিপির অঙ্কটি ২৮৮০ ডলার। অর্থাৎ যে দেশটিকে জিডিপির মাপে ভারত টপকে গেল বলে– তার মাথাপিছু জিডিপি ভারতের প্রায় ১২ গুণ। চীনের এখন মাথাপিছু জিডিপি ১৩০০০ ডলারের বেশী অর্থাৎ চীন দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্নত দেশ হিসেবে গণ্য হওয়ার দোরগোড়ায় এই দূরত্ব চীন অতিক্রম করেছে দেড় দশকে। উন্নত দেশ হতে গেলে মাথাপিছু জিডিপি হওয়ার কথা অন্তত ১৪,০০৫ ডলার।

দু'জনের পরিবারের মাসিক আয় ৫০,০০০ টাকা আর দশজনের পরিবারের মাসিক আয় ৬০,০০০ টাকা– কোন

পরিবারটি আর্থিকভাবে ভালো অবস্থায় আছে, তা বোঝার জন্য অর্থশাস্ত্রী হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট।

ভারতের অল্প কিছু মানুষের হাতে যদি দেশের বেশীরভাগ সম্পদই জমা হয়ে থাকে আর তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক যদি বিশ্বের সেরা একশো জন ধনীর মধ্যে স্থান পেয়ে যায় আর দেশের পঞ্চাশ শতাংশের গড় আয় যদি মাসিক ছ'হাজার টাকার ও কম হয় তাহলে বিশ্বের চতুর্থ ধনীতম দেশ হওয়ার তকমা পেয়ে দেশের মানুষের লাভ কী? পয়সার অভাবে যে পরিবারের ছেলেমেয়েদের আজকে স্কুল ছেড়ে কাজের সন্ধানে বেরোতে হচ্ছে আর পয়সার অভাবেই যে পরিবারের মেয়েদের এই বয়সে লোকের বাড়ি কাজ করতে হচ্ছে বা কম বয়সে পাচার হতে হচ্ছে সেই দেশ GDP-তে জাপানকে পিছনে ফেললে কি তাদের অবস্থার কিছু সুরাহা হবে? না, এইভাবে যেদিন ভারত জার্মানিকে পেছনে ফেলে যখন বিশ্বের তিন নম্বর ধনী দেশ হবে তখন তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে?

ফলে এই খবরে এত নাচানাচি করে লাভ কী? আর এত যারা নাচাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যই বা কী?

## শোক সংবাদ

শান্তিরঞ্জন পাল। থেমে গেল একটি জীবন। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এ পি ডি আর বীজপুর শাখার সভাপতি শান্তিরঞ্জন পালের জীবনাবসান হয়েছে ৩০ মে, ২০২৫।

সংগ্রামী জীবনের একটি দৃষ্টান্ত শান্তি'দা। যদুনাথ পাল ও মা রুক্মিনী দেবীর চতুর্থ সন্তান শান্তিরঞ্জন পালের জন্ম ১৯৪৮ সালে, ঢাকা জেলার বসাইল গ্রামে। দেশভাগের পর কাঁচরাপাড়ায় সব্জি বিক্রেতা বাবার চতুর্থ সন্তান শান্তি'দার জীবন ছিল মাটি থেকে উঠে আসা এক সংগ্রামের জীবন। পরিবারে আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখতে খুব অল্প বয়সেই কাজে লেগেছিলেন সাইকেলের দোকানে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে হরিণঘাটা রাষ্ট্রীয় পশুপালন খামারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দেন।

তৎকালীন কর্ম্মচারী সমিতি ছিল শাসকদল সি পি আই এম পরিচালিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি। মতাদর্শগত ফারাকের কারণে সেই কমিটির সাথে অনিবার্য্য সংঘাত শুরু হয়। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখতেন শান্তি'দা। ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর, বাংলা বন্ধের দিন লাল ঝান্ডা নিয়ে চলেছেন মিছিলে, বন্ধের সমর্থনে। রক্ত পতাকা নিয়েই গ্রেপ্তার হলেন শান্তি'দা। তিন বছরের জেল হল। হরিণঘাটার সরকারি চাকরি থেকে সাসপেন্ড হলেন। জীবিকা না থাকলে জীবন চলবে কী উপায়ে? অথৈ জলে পড়ল শান্তি'দার পরিবার। জীবিকার সন্ধানে ট্রেনে পেন বিক্রিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। হকারি। পেন বিক্রেতা হকার হয়ে গেলেন শান্তিরঞ্জন পাল। তিনি মনে করতেন, এই সমাজে কোনও কাজই ছোট নয়; সব কাজেরই গুরুত্ব ও শ্রমের মর্যাদা আছে।

পেন বিক্রেতা শান্তি দা'র সাথে এই সময়েই আলাপ হয় অপর পেন বিক্রেতা, রাজনৈতিক কর্ম্মী গৌর চক্রবর্তীর সাথে। চিন্তা ও মতাদর্শগত মিলন হল দুই বন্ধুর। তিন বছর পর ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে জেল মুক্তি ঘটলো শান্তিদা'র। একেবারে বেকসুর খালাস। আবার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। ইউনিয়নের ভাঙন এবং সংযুক্তির পর্ব্ব পেরিয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ, নবপর্য্যায় ১৯৯১ সালে তৈরী হল। শান্তি'দা নবপর্য্যায় যোগ দিলেন। শান্তি'দা ,ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ (নবপর্য্যায়) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। নবপর্য্যায়ে দীর্ঘদিন তিনি কোষাধক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করার সময় তাঁর দৃঢ়তা ও সততা ছিল সবার আলোচ্য। সংশোধনবাদী বামপন্থী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে শান্তিদা ছিলেন এক সাহসী জীবনের উদাহরণ। শান্তি'দা কমলা'দির সঙ্গে বেঁধেছিলেন। তখন শান্তিদা বাইশ, কমলাদি পনেরো।

জীবনের এই সংগ্রামী চেতনাই তাঁকে কখনও মাথা নোয়াতে শেখায়নি। শান্তি'দা আমাদের শিখিয়ে গেছেন, এক বা দুই দিন নয়, এক বা দুই বছরও নয় বরং সারাজীবন ধরে নিজের আদর্শের প্রতি অটল থাকলেই একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মী হয়ে ওঠা যায়।

এপিডিআর বীজপুর শাখায় সাথী শান্তিরঞ্জন পাল পঁচিশ বছরের সদস্য ছিলেন। অন্যান্য সংগঠনের পাশাপাশি এপিডিআর-এও তার অগ্রণী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা আজও আমাদের শিক্ষণীয়। সমিতি ভাঙনের সময় বীজপুর শাখাতেও সেই ভাঙনের আঁচ এসে পড়ে। শাখা সদস্যরা ঐ সময় দ্বিধান্বিত থাকলেও শান্তিদার নেতৃত্বেই ২৮তম সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটির সাথেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয় শাখার অনেক সদস্য। তার ভিত্তিতেই শাখা পূর্নগঠিত হয়। সংগঠন সঙ্কটের মুখে পড়লে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হয় সেই শিক্ষা আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি। খুব দুর্বল অবস্থায় শুরু হলেও পূর্নগঠনের পরবর্ত্তীতে বীজপুর শাখা সাধ্যমত কর্ম্মসূচী নিতে থাকে।

শান্তিরঞ্জন পাল এপিডিআর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এখানেও শান্তি'দা মানবাধিকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের রক্ষায় দৃঢ়চেতা, সাহসী মতামত জানাতে দ্বিধা করেননি। এপিডিআর, বীজপুর শাখা, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এবং অন্য সকল সদস্যগণ, সাথী শান্তিদার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আগামী দিনে শাখা পরিচালনার কাজে শান্তিদার কাছ থেকে যে-শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা' পাথেয় হয়ে থাকবে।

**– মৌতুলী নাগ**